ব্রহ্মসূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথমখণ্ড।

(ব্রহ্মসূত্র, বঙ্গানুবাদ এবং সরলানাম্নী বঙ্গব্যাখ্যা।)

হিন্দুপত্রিকাসম্পাদক

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্ এ বি এল্ বেদান্তবাচস্পতি দ্বারা

ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

হিন্দু-পত্রিকার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

যশোহর হইতে প্রকাশিত।

১৩১৮।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, সংস্কৃত-কলেজের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

মহাত্মন্!

বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে যখন আপনার এবং প্রথিতযশা স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে, সংস্কৃতকলেজের ইংরেজীবিভাগে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখন সংস্কৃতভাষা-সমুদ্রে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি যে সমস্ত অপূর্ব্ব রত্নরাজী বিরাজিত আছে, পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে তৎসম্বন্ধে একপ্রকার বিকৃত ধারণা ছিল। কিন্তু, সংস্কৃতকলেজের সুবৃহৎ পুস্তকালয়ের সাহায্যে, এবং ভবৎপ্রমুখ পূজ্যপাদ পণ্ডিতমণ্ডলীর সংসর্গে, ঐ সমুদয় রত্নরাজীর প্রতি যে অনুরাগ জন্মে, সেই অনুরাগ আপনারই স্নেহে বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্নস্থানে কতিপয়বর্ষ অবস্থিতিসময়ে, শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতমহোদয়গণের অনুগ্রহে, ঐ অনুরাগটী প্রাণের অঙ্গীভূত হয়, এবং ব্যাখ্যাসহ প্রাচীন শাস্ত্রাদি প্রচার—জীবনের একটী স্থির সংকল্পরূপে অবধারিত হয়। এই সংকল্প কার্য্যে পরি-

ণত করিবার প্রথমসময়ে—দশবৎসর পূর্ব্বে—আপনার আশীর্ব্বাদ আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিল। আপনার নিকট আমি অশেষ প্রকারে ঋণী। আমার প্রতি আপনার স্নেহ অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ, তাহার প্রতিদান আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার ধারণা যে, এই সামান্য সানুবাদ বেদান্তসূত্র ও সরলাব্যাখ্যা, আপনারই স্নেহের ফলস্বরূপ, সুতরাং ভালই হউক, মন্দই হউক, ইহা আপনার অপ্রিয় হইবে না। এই ব্যাখ্যা আপনার নামে উৎসর্গ করিবার উপযুক্ত না হইলেও, উপরোক্ত বিশ্বাসেই, আপনার দিগন্তবিশ্রুত নামের সহিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটী অচ্ছেদ্যসম্বন্ধ সংস্থাপন করিলাম।

যশোহর
৭ই ফাল্গুন ১৮২৫।

প্রণত
শ্রীযদুনাথ——

প্রথম-সংস্করণের ভূমিকা।

(পরিবর্ত্তিত)

মহর্ষি-বাদরায়ণ-প্রণীত "ব্রহ্মসূত্র" চিরদিনই দর্শনশাস্ত্র-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। বর্ত্তমানযুগে পাশ্চাত্য-প্রদেশীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিনব প্রদীপ্ত আলোক অস্মদ্দেশের বক্ষে পতিত হইয়াছে, তাহাতেও এই ব্রহ্মসূত্রের গৌরবভাতি বিন্দুমাত্র মলিন হয় নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতে যে এক মহাসত্য আবিষ্কৃত এবং অঙ্গীকৃত হইতে চলিয়াছে, তাহা বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বিশ্বের কারণনির্ব্বাচনে বহুত্ব হইতে ক্রমশঃ একত্বে উপনীত হওয়া যে বেদান্তসিদ্ধান্ত, তাহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রদেশের বিজ্ঞানবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন। জীবজগৎ এবং জড়জগৎ একই সূত্রে গ্রথিত, ইহার ভেদগুলি আপাতভেদ মাত্র, প্রকৃতপক্ষে নহে, এই বেদান্তের মহাসত্যও যথার্থরূপে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে। অতি প্রাচীন-কালে মহর্ষি বাদরায়ণ এই সূত্রগুলি গ্রথিত করেন। ভারতের নানাবিধ দুর্দ্দৈব অতিক্রম করিয়াও, মহর্ষির হৃদয়ের ধন মহামূল্য সত্যস্বরূপ সূত্রগুলি আমাদের পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এই সূত্রগুলি দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংক্ষিপ্ত আকারে গুরুতর তত্ত্বের বিবেচনা করিতেই সূত্ররচনা। সূত্র—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং

সারবৎ বিশ্বতোমুখং, অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ। সূত্র অর্থ—স্বল্পাক্ষরে মহৎ-সত্য গ্রথিত করা। শিষ্যশিক্ষার জন্য সূত্র রচিত হইত। সূত্র হইলেই সুতরাং কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য এই গুলির প্রকৃত রসাস্বাদন সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। সূত্রবোধের জন্য প্রাচীনকালে ভাষ্য রচনা করা হইত, সেই ভাষ্য-বোধের নিমিত্ত আবার টীকাদি রচিত হইত। ঋষি বাদরায়ণপ্রণীত সূত্রের পূজাপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত ভাষ্য আছে। ভগবৎ-শঙ্করকৃত ভাষ্যের মাননীয় আনন্দগিরি এবং মাননীয় গোবিন্দানন্দ ও পণ্ডিত-প্রবর বাচস্পতিমিশ্রকৃত টীকা আছে। এই ব্রহ্মসূত্রের আবার দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি নানা মতের ভাষ্য আছে। পূজ্যপাদ রামানুজ স্বামী, বল্লভাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বলদেব প্রভৃতি—শ্রীভাষ্য, অণুভাষ্য, মাধ্বভাষ্য, গোবিন্দভাষ্য প্রভৃতি বহুভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য মহর্ষি ঔড়ুলোমিকৃত বৃত্তির অনুসরণ করিয়া দ্বৈতাদ্বৈত-মতপ্রতিপাদক "বেদান্তপারিজাতসৌরভ" নামক ব্রহ্মসূত্র-বাক্যার্থ বা নিম্বার্কভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন, ইহার অনুগামী হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য "বেদান্তকৌস্তুভ" নামক আর এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইহার উপর পণ্ডিত কেশব-কাশ্মীরী "কৌস্তুভপ্রভা" টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করকৃত শারীরক ভাষ্যের ব্রহ্মবিদ্যাভরণ নামে একখানি টীকাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাচস্পতিমিশ্রকৃত শঙ্করভাষ্যটীকা ভামতীর "বেদান্ত-কল্পতরু" নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং ঐ বেদান্তকল্পতরুরও "বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল" নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত

ব্রহ্মসূত্রের পঞ্চপাদিকা নাম্নী টীকাও দেখা যায়, ঐ পঞ্চপাদিকার উপর পঞ্চপাদিকা-বিবরণ নামে এক ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাওয়া যায়। পঞ্চপাদিকাবিবরণের তত্ত্বদীপন নামক এক ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। এই ব্রহ্মসূত্রের আরও অনেক প্রকার ভাষ্য, টীকা, বৃত্তি আছে। ব্যাখ্যাদি সহিত ব্রহ্মসূত্র এক সাগরসদৃশ জ্ঞানরত্ন-ভাণ্ডার। সুতরাং বেদান্তসূত্রের বিবিধ মতের ভাষ্য এবং বহুবিধ টীকা, এক জীবনে পরিসমাপ্ত করা সুসম্ভব নহে। বাদরায়ণের পূর্ব্বে আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি প্রাচীন বৈদান্তিকগণ বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না, কেবল প্রাচীনগ্রন্থে তাঁহাদের মতবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে প্রাচীনকালেও বেদান্তশাস্ত্রের বহুল প্রচার বা চর্চ্চা ছিলনা। এদেশে ন্যায়-শাস্ত্রেরই ভূয়সী চর্চ্চা ছিল। কেহ কেহ বেদান্তের চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। এই অধ্যয়নও কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল।

বেদান্তশাস্ত্রের ভিত্তি বেদ, বেদের অন্তভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্-ভাগকে "বেদান্ত" বলে। বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের আপাতবিরোধী বিধিনিয়মাদির সামঞ্জস্যসংস্থাপন উদ্দেশ্যে, মহর্ষি জৈমিনি যেমন পূর্ব্বমীমাংসা বা মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়ক তথ্য-নির্ণয় সম্বন্ধে উপনিষদে যে বহুবিধ আপাতবিরোধী শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়, তাহার সাম্যসংস্থাপন করিতে গিয়াই মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন রচনা করেন। পূর্ব্বমীমাংসা এবং বেদান্ত উভয়ই বেদানুগত, কিন্তু মীমাংসা কর্ম্মকাণ্ড লইয়া, এবং বেদান্ত

জ্ঞানকাণ্ড লইয়া, উভয়ের মধ্যে এই মৌলিক প্রভেদ। উভয় মীমাংসাই বেদের উপর নির্ভর করে, এবং এই উভয়শাস্ত্রে বেদের উর্দ্ধে কোন যুক্তির স্থান নির্ব্বাচন করা হয় নাই। কিন্তু ফলে এক দাঁড়ায় নাই। মীমাংসা যজ্ঞাদিকর্ম্মরূপ ধর্ম্মে নির্ভর করেন, বেদান্ত ব্রহ্মে নির্ভর করেন।

অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র যদিও বেদের দোহাই দেন, তথাপি তাঁহারা যুক্তির উপরই অধিক নির্ভর করেন। বেদান্তদর্শনের উৎকর্ষ এই যে, ইহাতে শাস্ত্র এবং যুক্তির সমন্বয় করা হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্য, আপ্তবাক্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিলেও, উহা তাঁহার দর্শনের ভিত্তি-স্বরূপে গ্রহণ করেন নাই। পাতঞ্জলদর্শন সর্ব্ববিষয়ে সাংখ্যের অনুগামী, কিন্তু প্রভেদ এই যে, সাংখ্য নিরীশ্বর, পাতঞ্জল সেশ্বর। সাংখ্যেরা ২৪ তত্ত্বের উপর বহু পুরুষ বা জীবাত্মার অবতারণা করেন। পাতঞ্জল আবার তাহার উপর একটী ঈশ্বর কল্পনা করেন। পদার্থবিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক একমত। বৈশেষিকের মূলে অদৃষ্ট, ন্যায়ের মূলে ঈশ্বর। বৈশেষিক অদৃষ্টে নির্ভর করিলেও অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ইঙ্গিত করেন। মীমাংসক-সম্প্রদায়-বিশেষ, যাগাদি-জন্য অদৃষ্টকে ধর্ম্মনামে অভিহিত করিয়া, প্রকারান্তরে অদৃষ্টের শরণাপন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মের সূক্ষ্মাবস্থারূপ ফলপ্রদ স্বাধীন অদৃষ্ট স্বীকার করায় সে প্রসঙ্গে ঈশ্বর-সিদ্ধির অবকাশ রাখেন নাই। মীমাংসক কর্ম্মফলোৎপত্তির জন্যই প্রধানতঃ অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব মানেন, কিন্তু বৈশেষিক সংসারের সমস্তের উৎপত্তির মূলেই অদৃষ্টের

লীলাখেলা বর্ণন করেন। তাঁহাদের মতে বিশ্বব্যাপার অদৃষ্টায়ত্ত, এমন কি মনের আদিম কর্ম্মও অদৃষ্টাধীন। মীমাংসক, অদৃষ্ট সে ভাবে মানেন না। যাগাদি কর্ম্ম শেষ হইলেই স্বর্গাদিফল-লাভ হয় না, যাগ ত ফুরাইল, স্বর্গফল দিবে কে? এই ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া মীমাংসক বলেন, যাগ স্থূলরূপে ফুরায় কিন্তু সূক্ষ্ম অদৃষ্টরূপে থাকে, তাহাই ফল দেয়। এই তত্ত্ব মীমাংসকের প্রাণ।

অস্মদ্দেশীয় ষড়্‌দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম বিভাগে পূর্ব্বমীমাংসা উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত), দ্বিতীয় বিভাগে সাংখ্য পাতঞ্জল, তৃতীয় বিভাগে ন্যায় বৈশেষিক। অন্যান্য দেশে যেমন ধর্ম্মের সহিত দর্শনের সম্বন্ধ নাই, অস্মদ্দেশে তদ্রূপ নহে। এতদ্দেশের দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে সংস্পৃষ্ট। আপাতত দেখিতে গেলে ষড়্‌দর্শন অনেক সময়ে বিরোধী বোধ হয়, তাহাদের ব্যাখ্যাগুলিও ঐ ভাব সমর্থন করে, কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে, এই সকল দর্শনশাস্ত্র বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বলিয়া প্রতীত হয়। প্রাচীন আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুও, ষড়্‌দর্শন যে স্ব স্ব অধিকারে পরস্পর বিরোধী নয়, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। যদিও বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন দর্শনের অবতারণা, তথাপি বেদান্ত-দর্শন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারীর জন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য দর্শনে আংশিক সত্যের বিকাশ, কিন্তু বেদান্তদর্শনে পূর্ণসত্য নিহিত রহিয়াছে। বেদান্তদর্শন অনুসারে জগতে ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এবং এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে অন্যান্য জ্ঞান সত্বর জন্মে। সামাজিক নৈতিক ইত্যাদি সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান বেদান্তদর্শনের ভিত্তির

উপর স্থাপিত করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিলেই উৎকৃষ্ট হইতে পারে।

বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি প্রাচীনশাস্ত্রের বহুল প্রচার উদ্দেশে, আমি ১০ বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুপত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি, এবং এই ১০ বর্ষকালের মধ্যে আমার সামান্য শক্তিদ্বারা হিন্দু-সমাজের সেবা যতদূর সম্ভবপর, তাহাতে আমি কদাপি ক্রুটী করি নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে প্রথমে হিন্দু-পত্রিকায় ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা বাহির হয়। তাহাই একত্রিত করিয়া আজ ব্রহ্মসূত্রের ১ম খণ্ড প্রকাশ করিলাম। বেদান্তসূত্র ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত, এক এক অধ্যায়ে কতকগুলি অধিকরণ, এবং এক একটী অধিকরণে কতকগুলি সূত্র আছে। অপর তিন অধ্যায় শীঘ্রই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যাখ্যা যতদূর সরল করা সম্ভব, তাহাতে চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাতে বেদান্তের মূলতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে চেষ্টার ক্রুটী করি নাই। সুতরাং এই ব্যাখ্যার নাম 'সরলা' রাখিলাম। "সরলা" যদিও আমার মানসোদ্ভূতা, তথাপি যদি "সরলা"য় সরলতার ভাব কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তাহা আমার প্রিয়বন্ধু হিন্দু-পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং সম্মিলনীস্কুলের দ্বিতীয়পণ্ডিত বাবু শরদিন্দু মিত্রের যত্নে ও পরিশ্রমে, বলিতে হইবে। আমার ব্যাখ্যাগুলি তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মধুর এবং সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করাতে, আজ "সরলা"কে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলাম। ব্যাখ্যার ভাবাংশে যদি দোষ

থাকে, তাহা সম্পূর্ণ আমার, কিন্তু ভাষায় যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা সম্পূর্ণ শরদিন্দু বাবুর।

এই গ্রন্থদ্বারা যদি বাঙ্গালা ভাষার, এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তাহাহইলে স্বীয় শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইব। ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

যশোহর।
৭ই ফাল্গুন ১৮২৫ } গ্রন্থকার।

দ্বিতীয়-সংস্করণের ভূমিকা।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে প্রয়োজন-বোধে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন সংশোধনাদি করিয়াছি। সূত্রগুলির অধিকরণ-বিভাগ করিয়া দিয়াছি। ইহাতে পাঠার্থিগণের কিঞ্চিৎ উপকার হইবে, আশা করা যায়। প্রথম সংস্করণে যে কতিপয় বিষয়ে শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুসরণ করা হয় নাই, সে সকল বিষয় এবারও সেইরূপই রাখিয়াছি, কোনও পরিবর্ত্তন করি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মহর্ষি বাদরায়ণ যেখানে "মনুষ্যাধিকার" ঘোষণা করিয়াছেন, সেখানে শঙ্কর "ত্রৈবর্ণিকাধিকার" অবধারণ করিয়াছেন। মনুষ্যপদের এইরূপ সঙ্কোচ শ্রুতিস্মৃতিসম্মত বলিয়া মনে করিবার অনুকূলে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরঞ্চ ইহার প্রতিকূলে

প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং এ বিষয়ে সত্যপ্রকাশ-প্রবৃত্তি গোপন করা প্রকৃষ্ট পন্থা মনে করি নাই। স্ফোটবাদের আলোচনায়ও শঙ্কর-দেবের ন্যায় সংক্ষেপ-ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি নাই, কারণ শব্দব্রহ্মতত্ত্ব, শাস্ত্রের এক বিরাট্ অংশ। ইহার বিস্তৃত বিবৃতি, ধর্ম্মপিপাসু হিন্দুর নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রচলিত ব্যাখ্যার গড্ডালিকাপ্রবাহে ভাসিয়া যাওয়া অপেক্ষা যথাসাধ্য শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রমর্ম্মোদঘাটন করিয়া সত্যের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করাই সমীচীন,—এই সিদ্ধান্ত হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় অনেক স্থলে প্রচলিত ধারণার প্রতিকূল সিদ্ধান্তও প্রকাশ করিতে হইয়াছে, ইহাতে আর্যঅধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে কিনা, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয় বেদান্ত-পাঠক-গণের নিকট আদৃত হওয়ায় দ্বিতীয়-সংস্করণের সৌষ্ঠব-সাধনে যথাসাধ্য শ্রম ও অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। মুদ্রণ-ব্যয় ও বাঁধাইয়ের খরচা, প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা এবার অনেক অধিক হইয়াছে, সুতরাং পুস্তকের মূল্যও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে ব্যয়ের অনুপাতে সে বৃদ্ধির পরিমাণ অতি অল্পই হইয়াছে। যাহাতে বঙ্গীয় বিদ্বৎ-সমাজে ব্রহ্মসূত্রের ভূয়ঃপ্রচার হয়, ভারত-গৌরব ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা বিস্তৃতি লাভ করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এ সংস্করণ প্রচার করিতেছি। দুরূহ দার্শনিক বিষয় সকল পূর্ব্বাপর যেরূপ পারিভাষিক শব্দসমূহ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, আমিও তাহাই করিয়াছি, তবে সেই সকল দার্শনিক পরিভাষা সরল ভাষায় বুঝাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। আশা

করি, ইহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গ পরিভাষাদুর্গের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া, ব্রহ্মসূত্রতত্ত্ব অবলোকন করিবার সুবিধা পাইবেন। কথার আবরণে আসল জিনিষ ঢাকা থাকে, ইহা আমার অভিপ্রেত নয়। এই সংস্করণে ভাষা বা ভাবের যে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তাহার দোষ-গুণ সমস্তই আমার ন্যায্য প্রাপ্য। দোষের ভাগ লইবার জন্য মস্তক পাতিয়া আছি, গুণভাগ যদি কিছু থাকে, শ্রীভগবানে অর্পিত হউক্, ইহাই আমার কামনা। ফলাফল-বিচারের অধিকার আমার নাই, কর্ম্মেই আমার পরিনিষ্ঠা। ভগবৎকৃপায় যে ব্রহ্ম-সূত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিলাম, ইহাতেই আমি কৃতার্থ। এই সংস্করণ আদৃত হইলে আনন্দিত হইব। ওঁ তৎসত্ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

যশোহর।
মাঘীপূর্ণিমা ১৮৩৩ }　　গ্রন্থকার।

ব্রহ্মসূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

১। অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।

২। জন্মাদ্যস্য যতঃ।

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।

৪। তত্তু সমন্বয়াৎ।

১। অতএব তৎপর ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা।

২। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব বিকাশিত, যাঁহা দ্বারা পালিত ও যাঁহাতে সংহৃত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

৩। জ্ঞানোপায়স্বরূপ শাস্ত্র হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, ব্রহ্মই জগতের কারণ।

৪। সর্ব্বশাস্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল উৎস; তাহাদের অর্থ-সমন্বয়ে ব্রহ্ম-তত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়। (এই চারিটী সূত্রের দ্বারা ৪টী অধিকরণ রচিত।)

"কুতশ্চ কোঽহং" আমি কোথা হইতে আসিলাম এবং আমিই বা কে, এই চিন্তা যে দিন মানবের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রথম উদিত হয়, সেই দিন হইতেই তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার আরম্ভ। মানবের অতি পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যখন জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের মীমাংসার্থ কোন চেষ্টারই উন্মেষ ছিল না, তখন এই আত্মচিন্তার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা ঠিক্ অনুমান করা কঠিন; কিন্তু মানবের বিবর্ত্ত-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উন্নতির ক্রম-পরম্পরায় ক্রমশঃ যে ঐ আত্মচিন্তা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। "মানব কি, মানবের অদৃষ্ট কি"—এই জ্ঞান-পিপাসার প্রবল প্রেরণাতেই মানব কবি, মানব ঋষি মানব ভবিষ্যদ্বেত্তা। এরূপ মনে করা ভুল যে, অসভ্য জাতির চিন্তা কেবলই বহি-র্বিষয়িণী, এবং উহা আদৌ অন্তর্বিষয়িণী নহে। মানব যে কোন দেশীয় বা যে কোন জাতীয়ই হউক্ না কেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন তাহার স্বপ্নাতীত ছিল, তৎপূর্ব্বকাল হইতেও তাহাকে অহংতত্ত্বের আধ্যাত্মিক রহস্য-মীমাংসায় কোন না কোনরূপে সচেষ্ট দেখা যায়। এরূপ না হইলে, ইহা অস্বাভাবিকতাজনিত বিস্ময়ের বিষয় হইত।

মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর, দুঃখ-সঙ্কুল ও ইহার আদ্যন্ত দুর্জ্ঞেয় রহস্য-সমাকুল। মানবের যদি পুনর্জন্ম না থাকে, কেবল যদি মরিবার জন্যই বাঁচিতে হয়, তবে মানব কি পরিণাম লক্ষ্য করিয়া জীবন ধারণ করিবে? মানবের "মাটির শরীর" যদি কেবল মাটি হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহার ভোজনার্থ শস্যোৎপাদন, বাসার্থ গৃহপত্তন, আবরণার্থ বস্ত্র-বয়ন, আভরণার্থ অলঙ্কার গঠন

ইত্যাদি ব্যাপারে কেন মানব এত বিব্রত হইবে ? ইহা যদি এতই অসার, তবে ইহার জন্য কে এত "ভূতের বেগার" খাটিতে চায় ? অতএব "মানবজীবনে এই দেহ অপেক্ষা কি স্থায়ী পদার্থ বা সারতত্ত্ব আর কিছুই নাই ?" এইরূপে প্রথমে আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। এই দেহই কি "আমি"—না এই দেহ "আমার ?" এইরূপ বিতর্কে মানব-মনের মোহাবগুণ্ঠন ধীরে অপসারিত হয়, ধীরে অধ্যাত্মালোক উদ্ভাসিত হয় ; ধীরে মানব আত্মদর্শনের আভাস পায়, এবং তখন মনে মনে বলে "আমি দেহ নই, দেহই আমার ; আমি দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কিছু, নচেৎ আমার এই "আমি"র জ্ঞান কোথা হইতে আসিল ? "আমিই নাই" বা "আমি কিছুই না" এরূপ চিন্তাত কখনও আমার আসে না। আমিই হই এই "আমি"—আর আমার এই দেহ "আমি"র আধার মাত্র ; অতএব আমার এই আধার স্বরূপ দেহটারই মৃত্যু ঘটে, আধেয় "আমির" মরণ নাই। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বোলোকঃ নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ" অর্থাৎ যদি আত্মার অস্তিত্বের প্রসিদ্ধি না থাকিত তবে সকল লোকই 'আমি নাই'। এরূপ অনুভব করিত।

মানুষ এইরূপে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, দেহীই বিষয়ী (Subject) এবং দেহ ও অন্য যে কোন পদার্থ, সমস্তই বিষয় (Object) ; মানুষের আমিত্ব বা আত্মতত্ত্বই জ্ঞাতা এবং আর সমস্তই জ্ঞেয়। মানুষ ক্রমে স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে, তাহার এই দেহ একখানি রথস্বরূপ, মন প্রগ্রহস্বরূপ এবং আত্মস্বরূপ সে স্বয়ং তাহাতে

রথীরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া অপর সমস্তের শাসন-পরিচালন করিতেছে। শাস্ত্র স্পষ্ট তাঁহাই বলিয়াছেন।—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াংস্তেষু গোচরাণ্॥" (কঃ উঃ)

এতাবতা মানুষ বুঝিতে পারে যে, মৃত্যু কেবল তাহার দেহকেই অধিকার করিতে পারে, তাহার আত্মাকে নহে। মানুষ ক্রমে "নায়ং হন্তি ন হন্যতে"—গীতোক্ত এই পরম তত্ত্বের আভাস পায়।

"তবে কি আত্মা চিরসৎ বা চির নিত্য"—(আপেক্ষিক সৎ বা আপেক্ষিক নিত্যের অতীত) অন্তরে তখন এই প্রশ্নের উদয় হয় ও ইহার সমাধান-সাধনের চেষ্টা হয়। "আত্মা জন্মিলে আর মরে না" এ সিদ্ধান্ত ন্যায়-নিকষে টিঁকে না। জন্ম মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক। জন্মিলেই মরিতে হইবে। "জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" (গীতা)। আত্মা যদি জন্মেন, স্বীকার করা যায়, তবে তিনি মরেনও বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যিনি মরেন না, তিনি জন্মেনও না। আত্মার যদি মৃত্যু নাই, তবে জন্মও নাই।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্।
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ॥
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" (গীতা)

কিন্তু আত্মার মৃত্যু অপ্রতিপন্ন হইলে, জন্মও যে অপ্রতিপন্ন,

অধ্যাত্মালোক বঞ্চিত মানব তাহা না বুঝিয়া, আত্মাকে 'জাত' মনে করে। সে মনে করে যে, তাহার আত্মা "ঈশ্বর" নামক এক উচ্চতর আত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট; অন্যান্য আত্মা হইতে তাঁহার নিজাত্মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জ্ঞান-বৃদ্ধি সহকারে মানব বুঝিতে পারে যে, আমাদের পরস্পরের আমিত্বের পার্থক্য-বোধ কেবল মায়া-মোহের ফল মাত্র। যদি উপাধির অপগম হয়, তবেই সেই পার্থক্যের তিরোভাব হইবে। অবিদ্যা-কল্পিত উপাধিজন্যই একজে অনেক, অখণ্ডকে সখণ্ড, নিরবয়বকে সাবয়ব রূপে অনুভব করিতে হয়। এই আত্মার ভেদবোধ পরমার্থতঃ প্রকৃত নহে, উহা কেবল উপাধি-ভেদের আপাত-প্রতীত ফল মাত্র।

জ্ঞানোন্নত মানব জন্ম-মৃত্যুর পরস্পর অচ্ছেদ্য আপেক্ষিকত্ব পরিষ্কার অনুভব করিতে পারেন। উহার একের অপ্রতিপন্নতায় অপরের অপ্রতিপন্নতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "ন জায়তে ম্রিয়তে" শ্লোকের তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। আত্মার একত্ব ও অবিনশ্বরত্ব তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি বুঝিতে পারেন, আত্মা যদি নিশ্চয় অমর, তবে অবশ্য অজ; অতএব আত্মা অজ হইলে, তাঁহার (সৃষ্টিকর্ত্তারূপ) উচ্চতর আত্মার কল্পনাও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

জ্ঞানোন্নতির সহিত মানব বুঝিতে পারেন যে, যেমন একই সূত্র, বিবিধ আকৃতি, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ গন্ধবিশিষ্ট বিবিধ জাতীয় পুষ্প-সমষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকায়, এক বিচিত্র পুষ্পমালা রচিত হয়, তদ্রূপ এক আত্মা বিবিধ ভাব-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাধিসমূহে

অবস্থিত থাকায়, এই বিচিত্র বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে। কেবল মানব-দেহ বলিয়া নহে, এক সার্ব্বভৌম আত্মতত্ত্ব বা বিশ্ব-আমিত্ব বিশ্বের চেতনাচেতন সর্ব্বপদার্থেই বিরাজিত; তবে উহার ঐশ ভাব কোথাও জাগ্রত, কোথাও সুপ্ত; কোথাও বিকসিত, কোথাও অন্তর্নিহিত; কোথাও অঙ্কুরিত, কোথাও বীজভূত। ক্রমে যখন এই বিশ্ব-বৈচিত্র-বোধক অবিদ্যাজাত উপাধিসমূহের[১] নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণস্বরূপ এক আত্মাই অবধারিত হন, তখন সৃষ্ট ও স্রষ্টার কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হয়; তখন আত্মজ্ঞানী মানব, মহাবাক্যের অধিকারী হইয়া বলেন—"অহং ব্রহ্মাস্মি"!

এই ভৌতিক জগৎ তখন তাঁহার নিকট আর স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বোধ হয় না; উহা বিশ্ব-আমিত্বেরই এক বিবর্ত্ত-বিকাশ বোধ হয়। উহা স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, এই ভেদত্রয়শূন্য বোধ হয়। দ্বৈতজ্ঞ অন্তর্হিত হয়। তখন আত্মজ্ঞানী দেখেন যে, সর্ব্বভূতেই আত্মা এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূত।"

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ (গীতা)

(অর্থাৎ)

আত্মাকে সমস্ত ভূতে, সমস্ত ভূত আত্মায়।
সমদর্শী আত্মযোগী সর্ব্বদা দেখিতে পায়॥

যদি সর্ব্বভূতই আত্মময়, তবে এক মাত্র আত্মজিজ্ঞাসাই সর্ব্বজিজ্ঞাসার সারনিষ্কর্ষ, সন্দেহ নাই; সুতরাং অন্য সর্ব্ববিধ জিজ্ঞাসাই প্রকৃতপক্ষে অনর্থক ও অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। কারণ

পরিজ্ঞাত হইলে, কার্য্যও স্বতএব পরিজ্ঞাত হয়। ঘটত্ব-জ্ঞান মৃত্তিকাত্ব-জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত।

বৈদান্তিকেরা এই আত্মতত্ত্ব বা বিশ্ব-আমিত্বকেই ব্রহ্ম বলেন। কারণ ইহাই বৃহৎ—বিশ্বময়—অসীম ; ইহা হইতেই বিশ্বপদার্থের বিকাশ। "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্ত্বাচ্চ"—"ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থই বৃহত্ত্ববোধক।

যতক্ষণ তত্ত্বজ্ঞান না হয় ততক্ষণ মানব বিবেচনা করে যে, জগতের কিছুই স্থায়ী নহে। তাহার নিজস্ব বোধের সীমান্তর্গত সকল বস্তুরই অনিত্যত্ব সে অনুভব করে। ধন-মান,-স্ত্রী-পুত্র, গৃহক্ষেত্র, ঐহিক যা কিছু তাহার প্রিয়, তাহার সে অজ্ঞাত-দেশ-যাত্রায় কিছুই তাহার "সঙ্গের সাথী" নহে, ইহা বুঝিয়া, তাহার নৈরাশ্য-নিপীড়িত অন্তরাত্মা আর্ত্তস্বরে বলিতে থাকে 'তবে কি এ জীবন অলীক—অকিঞ্চিৎকর ও একটি তামাসার অভিনয় মাত্র ? যদি কোন নিত্য পদার্থই ইহার লক্ষ্য না হয়, এবং যাহা কিছু ইহার লক্ষ্যীভূত, তাহাই অলক্ষ্যে অনিত্যে পরিণত হয়, তবে কি মানব-জীবন কেবল মরীচিকাবৎ অমূলক ? তবে আর এ নিমেষস্থায়ী নিরর্থক জীবন-বুদ্বুদের জন্য এত চেষ্টা-বেষ্টনের স্বার্থ-সংগ্রামের কি প্রয়োজন ? ফলিতার্থে তবে "আমি" কেন ? এ "বিড়ম্বনাময় আমি" থাকা অপেক্ষা "আমি" আদৌ না হওয়াই কি ভাল ছিল না ?"

এইরূপে নৈরাশ্যে মুহ্যমান ও বিষাদে রোরুদ্যমান হইয়া ভ্রান্ত মানব যখন বুঝিতে পারে না যে, তাহার কোথায় যাইতে হইবে,

কি করিতে হইবে, তখন "কিং করোমি ক গচ্ছামি" অবস্থায়—সেই কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু জীবের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার ঘোর ঘনান্ধকারে ভারতীয় আর্য্যর্ষিই বেদান্তবিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত করেন এবং বলেন "বৎস! আশ্বস্ত হও। শোক করিও না। অমৃতের সন্তান তুমি, শুধু তাই কেন? তুমি স্বয়ংই অমৃত। তুমি আপনাকে চিনিতে শেখ, তবেই তোমার সর্ব্বসন্দেহ দূরীভূত হইবে, সর্ব্ব বন্ধন ছেদিত হইবে ও অবিদ্যার ইন্দ্রজাল অপসারিত হইবে। যখন তুমি তোমাকে চিনিবে, তখন তোমার জীবন সত্য ও সার্থক হইবে, উহা আর অলীক বা অনর্থক বোধ হইবে না।" শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

"भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥"

কিন্তু, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যায় উপনীত হইতে সর্ব্বসাধারণেরই সমানাধিকার-বিষয়ীভূত কোন একটি পন্থা নাই। উক্ত পন্থালাভ উপযুক্ত অধিকার-সাপেক্ষ—কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। আত্ম-বিজ্ঞান-দীপকে যাঁহার আত্মদীপনের অভিলাষ, তিনি অবশ্য ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসংযমন করিবেন; তিনি অবশ্য শান্ত, সমাহিত, ইহ-পারলৌকিক কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইবেন। মানুষের এমন অনেক আচারানুষ্ঠানের অভ্যাস আছে যে, তাহা ধর্ম্মকার্য্যবিশেষ বলিয়া বোধ হইলেও, তদ্দ্বারা বাস্তবিক আত্মবিকাশের বাধা জন্মে; সে সমস্ত অভ্যাসও শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচার দ্বারা অপসারিত করিবেন। অবশেষে আত্মদীপন-সাধন-সিদ্ধ গুরুর আশ্রয় গ্রহণে

কৃতার্থ বা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ,) দম (বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ,) তিতিক্ষা (দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা,) (উপরতি ভোগ-বৈরাগ্য,) শ্রদ্ধা (গুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস,) সমাধান (ঈশ্বরে চিত্তাভিনিবেশ,) গুরুর কৃপায় সাধ্য এই "ষট্‌সম্পত্তি" অর্জ্জন ভিন্ন আত্মজ্ঞান-লাভোপযোগী পূর্ণচিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই জন্য "অথ" শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্তশুদ্ধ্যাদির পর সাধকের যথার্থ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা আত্মবিজ্ঞান-শিক্ষার অধিকার সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে কথা এই যে, কি কারণে মানব ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্ম-বিদ্যার সাধনে ও অনুশীলনে রত হইবে? কারণ এই যে তদ্ভিন্ন মানবের শান্তি-লাভ সুদূরপরাহত। মানবের হৃদয়ে স্বতঃই ও সততই ঔৎসুক্যময় অদম্য জিজ্ঞাসা-প্রবাহ বহিতেছে যে "সে কি? সে কোথা হইতে আগত এবং কোথারই বা যাত্রী?" অতএব এই কারণেই (অতঃ) মানবের ব্রহ্ম-বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা।

আত্মানুশীলনের দ্বারাই মানব বুঝিতে পারে যে, আত্মাই জীবের সর্ব্বস্ব, আত্মাই কর্ত্তা বা প্রভু। তাহার মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই যন্ত্রস্বরূপ। আত্মাই যন্ত্রী। আত্মজ্ঞান-সাধক দেখেন যে, আত্ম-স্বরূপ তিনিই প্রকৃত জ্ঞাতা বা বিষয়ী, অপর সমস্তই জ্ঞেয় বা বিষয়। এই যে জ্ঞাতা, ইনিই আত্মা বা ব্রহ্ম। ইহার বহুত্ব-বোধ অজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। তরঙ্গ-হিল্লোলিত বারিধি-বক্ষে যেমন এক সূর্য্য বহু সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞান-বিক্ষেপ-বিকৃত মনে এক ব্রহ্মে বহুত্ব কল্পিত হয়। মনকে

শান্ত সমাহিত কর। জল থিতাইলে সূর্য্য এক, মন থিতাইলে ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তুমি আত্মজ্ঞানালোকে আলোকিত হও, সমস্ত ভেদ-বোধ চলিয়া যাইবে; জাতি-কুল-বর্ণ-বাধকতা বিলুপ্ত হইবে; সমস্ত জগৎ তোমার আপনার হইবে। "বসুধৈব কুটুম্বকং" বাক্য তোমাতেই সার্থক হইবে। হর্ষ তোমাকে চঞ্চল করিবে না, বিষাদ তোমাকে অবসন্ন করিবে না। জয় তোমাকে উত্তেজিত করিবে না, পরাজয় তোমাকে অভিভূত করিবে না। জীবন তোমাকে উৎসাহিত করিবে না, মরণ তোমাকে ভীত করিবে না। তখন তোমার হইবে—

"নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।" (গীতা)

তখন তুমি সর্ব্বশান্তি-প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু মাত্র বুদ্ধিগত-আত্মপ্রতীতিই যথেষ্ট হইবে না; আত্মার অদ্বৈতত্ব সাধন-সিদ্ধ জ্ঞানগতভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

"কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।"

হইলে অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়,
কোথা মোহ—কোথা শোক রয় ?

যে বুদ্ধিতে যে ভাবে আমরা বাহ্য বিষয় সমূহ অবগত হই, "আমি"—আত্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব সে বুদ্ধিতে—সে ভাবে অবগত হইবার বিষয় নহে। যে মুহূর্ত্তে তুমি 'আমি' কে জানিবে, সেই মুহূর্ত্তেই 'আমি' তুমি হইয়া যাইবে। বিষয়ীই বিষয়ীভূত হইবে। "আমি" সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু "আমি" জ্ঞেয় নহি। যাহাহউক্, সাধন-বলে এই আত্মার অলৌকিক অনুভূতি হয়।

"यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य नवेद सः।
अविज्ञातं विजानतां विज्ञानमविजानताम्॥" (কেনশ্রুতি)

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি আরও বুঝাইয়া দেন যে, দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শুনা যায় না, ভাবনার ভাবককে ভাবা যায় না, জ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানা যায় না। "নেতি—নেতি" ভাবের* অনুসন্ধানে,—ব্রহ্ম ইহা নহেন, উহা নহেন, যাহা কিছু আমরা জানিতে পারি, তাহা নহেন, এই ভাবের অনুসন্ধানে অবান্তর-ক্রমে আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করিতে পারি মাত্র। যাহাহউক্, মোটামুটি আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, নির্গুণ ব্রহ্ম মানব-জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হইলেও, সগুণ ব্রহ্মকে আমরা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে—অন্ততঃ মানিতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞানের এই আপাততঃ গৌরব যে, জগৎ-কারণের বহুত্বস্থলে ক্রমে এক্ষণে তদ্দ্বারা একত্ব-সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। এই বিশ্বের অনন্ত কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-প্রবাহ কল্পনায় অতিক্রম করিলে, মূলে মূলকারণ ব্রহ্মকেই পাই। অনবস্থা-দোষ-পরিহারার্থ সে মূলের মূল কল্পনা করি না।

এই বিশ্ব ব্রহ্মকেন্দ্র হইতে বিকাশিত। ইহার ভৌতিক সত্তা ব্রহ্মেই বিলীন ছিল; ব্রহ্মের সগুণত্বজনিত ইচ্ছা-শক্তির স্ফুরণে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়াছে। মহামহীরুহ বটবৃক্ষের শুণ্ড-শাখা-প্রশাখা-কাণ্ডাদি সমন্বিত প্রকাণ্ড দেহায়তন একদিন ক্ষুদ্রতম বট-বীজেই সূক্ষ্মতমভাবে নিহিত ছিল; ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া, বহিঃপ্রকৃতির অনুকূলতায় পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে কালে

বিশাল বটবিটপীরূপে পরিণত হইল! বৃক্ষ বীজে নিহিত, কার্য্য কারণে নিহিত; সুতরাং কার্য্য হইতে কারণ স্বতঃই সূক্ষ্ম। সমগ্র সংসারের মূল কারণ ব্রহ্ম। বিরাট্ বিশ্ব-বিটপীর বীজ ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মপদার্থ সর্ব্বময়রূপে বৃহৎ হইলেও কারণরূপে সুসূক্ষ্ম-অব্যক্ত—অননুভবনীয়। কারণ-ব্রহ্ম হইতেই কার্য্য বিশ্বের বিবর্ত্ত বিকাশ, এতাবতা অব্যক্ত কারণ-ব্রহ্ম আমাদের অজ্ঞেয় হইলেও, সুব্যক্ত কার্য্য দেখিয়া আমরা কারণ অনুমান করিতে পারি।

জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যুর ব্যাপার আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। একদিকে সৃষ্টি-স্থিতি, অপরদিকে লয়; এইরূপে সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে। মৃত্যু ভিন্ন জন্ম নাই, জন্ম ভিন্ন মৃত্যু নাই। জন্ম-মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক। একের অনুভূতি ভিন্ন অপরের অনুভূতি অসম্ভব। সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, ভাল-মন্দ, শৈত্য-উষ্ম্য, পাপ-পুণ্য এইরূপে জগৎ দ্বন্দ্বাত্মক।

জগতের সর্ব্ব পদার্থেরই জীবন-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব জগৎ-কারণেও জীবন-মরণ উভয়েরই কারণতা রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। কতকগুলি বীজ বপন কর; কতক অঙ্কুরিত হইবে, কতক অঙ্কুরিত হইবে না। অনঙ্কুরিত বীজ গুলিতে যথোচিত জীবন-শক্তির অপ্রতিষ্ঠাই অনঙ্কুরণের কারণ সন্দেহ নাই। জল, বায়ু, আলোক, উত্তাপ ইত্যাদির সমব্যবস্থা সত্ত্বেও এ বৈষম্য কেবল বীজগত উক্ত বিষম শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়াফল মাত্র। কারণের বহুত্ব হইতে আমরা একত্বে উপনীত হই। মূল কারণে ঐ দুই বিপরীত শক্তির সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি। উহার একটি

জনন-শক্তি, অপরটী মরণ-শক্তি। এই শক্তিদ্বয় পরস্পর সাপেক্ষ বিধায়, একের সত্তায় অন্যের সত্তা অবিচ্ছেদ্য। এই শক্তিদ্বয় জগতে অনবরত কার্য্যশীল। বৈদান্তিকেরা এই শক্তিদ্বয়ের আধারকে সগুণ ব্রহ্মের মায়াতত্ত্ব-রূপিণী বলেন। এই শক্তিদ্বয়ের অন্তর্ভূ্তই ত্রিগুণ। সত্ত্ব ও রজোগুণ জীবন-শক্তির অন্তর্ভূ্ত এবং তমোগুণ মরণ-শক্তির অন্তর্ভূ্ত; অথবা জীবন-শক্তি সত্ত্বরজোময়ী ও মরণ-শক্তি তমোময়ী। বিকাশ ও বৃদ্ধিই সত্ত্ব ও রজোগুণের ফল, সংহার বা অন্ধকারই তমোগুণের ফল। মনে কর, তুমি একটি ভাব-তত্ত্ব ভাবিতেছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত-নিষ্পত্তি হইতেছে না, তুমি তোমার মস্তিষ্ক খাটাইতেছ, ক্রমে সিদ্ধান্ত জমিয়া আসিতেছে, ইহাই রজো গুণের কার্য্য বা জন্ম ও বৃদ্ধি। পরে ভাবটী সুসম্পন্নভাবে সিদ্ধান্ত-পূত হইয়া দাঁড়াইল, সেই অবস্থাই সত্ত্বগুণের কার্য্যফল বা বিকাশ ও স্থিতি। আর যদি ভাবটি শতচিন্তার ব্যায়ামেও বিকসিত বা সিদ্ধান্ত-সংস্থিত না হইল, তবে তাহাই তমোগুণ বা লয়শক্তির কার্য্যফল।

দীপালোক-বিভা বিমল স্বচ্ছ চিম্‌নী দিয়াই বিকাশিত হয়, কিন্তু একটি মেটে হাঁড়ীর ভিতর আলো জ্বালিলে, তাহার বিভা কদাচ বাহিরে বিকাশিত হইবে না। যদি চিম্‌নী অমল ধবল হয়, অমল ধবল আলো বাহির হইবে; যদি রঞ্জিত চিম্‌নী হয়, রঞ্জিত আলো বাহির হইবে। এইরূপ আমাদের অধ্যাত্মালোক যখন আমাদের জীবনে বিকাশিত হয় না, তখন উহা তমোগুণরূপ মেটেহাঁড়ী-ঢাকা বুঝিতে হইবে। আর যখন রঞ্জিত অর্থাৎ একটু বিকৃত—বাহ্যবস্তু-মিশ্রিত-ভাবে বিকাশিত হয়, তখন উহা রজোগুণরূপ রঞ্জিত চিম্‌নী-

আবৃত; আর যখন উহা বিশোধিত বিমল বিভায় বিকাশ পায়, তখনই তদুপরে সত্ত্বের সেই অমল ধবল চিম্‌নী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

স্বচ্ছ-সত্ত্ব-স্ফটিকাধারে কাহার অধ্যাত্মালোক জ্বলে? যাহার পূর্ব্বোক্ত "শম-দমাদি ষট্ সম্পত্তি" অর্জ্জিত, মন কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত। সে স্থলে আত্মার স্বকীয় স্বাধীন সমুজ্জ্বল অবিকৃত আলোকই অতুলা প্রভায় প্রকাশিত।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিশক্তিই বিশ্বব্যাপারবিধাত্রী হইয়া আছেন। এই শক্তিত্রয় বা গুণত্রয় যখন ব্রহ্মে সাম্যাবস্থায় বিলীন থাকেন, তখন সেই ত্রিগুণসাম্যময়ী-মূলশক্তি বা আদ্যাশক্তিই "প্রকৃতি" পদবাচ্যা হন। এই প্রকৃতি হইতেই গুণত্রয়যোগে সর্ব্ব-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়। ব্রহ্ম স্ব-ইচ্ছায় সগুণ হইয়া, প্রকৃতির এই গুণত্রয়যোগেই রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে শিব হইয়াছেন এবং সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে রত আছেন। ব্রহ্মকে আমরা নির্গুণ অব্যক্ত তত্ত্বে জানিতে পারি না সত্য, কিন্তু এই ত্রিগুণাবতার ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে জগতের সৃষ্টিস্থিতি-সংহার কার্য্যে তাঁহাকে সগুণ ব্যক্ত তত্ত্বে উপলব্ধি করিতে পারি। ব্রহ্মের বিশ্ব-মূল-কারণত্ব এই ত্রিগুণাশ্রিত সগুণভাবেই জ্ঞাতব্য।

ব্রহ্মের বিশ্বকারণত্ব যে কেবল দার্শনিক যুক্তি-তর্ক-বিচারেই বোধ্য, তাহা নহে; স্মরণাতীত কাল হইতে—মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে উহা স্বতএব স্পষ্টভাবে মুদ্রিত। বিশ্বকারণত্ব-রূপে ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিশ্বাস মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পত্তি।

ভৃগুবারুণী পিতৃসকাশে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চাহিলে, পিতা বরুণ বলিলেন "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি।" অর্থাৎ—

এই ভূতগ্রাম যাঁহ'তে জনিত,
জন্মিয়া রহিছে যাঁহাতে জীবিত,
লয়ে হয় পুনঃ যাঁহাতে নিহিত,
তিনি ব্রহ্ম, তুমি হওহে বিদিত।

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ৩৷১) আনন্দস্বরূপ হইতে ভূতগ্রাম সম্ভূত, আনন্দস্বরূপেই নিহিত হয়।

প্রাচীন ভারতের ঋষি-মুখ-নির্গত ভগবৎপ্রত্যাদিষ্ট সিদ্ধবাণী-সমূহের সমষ্টিই সনাতন সত্যপূত বেদশাস্ত্র। উহা ব্রহ্মের প্রতিপাদক। কেবল আমাদিগের শাস্ত্রই যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে, এমন নহে ; সর্ব্বজাতির সর্ব্ববিধ শাস্ত্রই স্বাধিকারানুরূপে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মই বিশ্বকারী, ব্রহ্মই বিশ্বধারী, ব্রহ্মই বিশ্বহারী, ইহাই সর্ব্ববেদ-সম্মত সার সিদ্ধান্ত। যেখানেই ব্রহ্মতত্ত্ব-বর্ণনা, জগৎ-কারণ-আলোচনা, সেইখানেই ঐ অর্থ মূর্ত্তিমান্। সকল শাস্ত্রে আপাততঃ নানাবিধ বিভিন্ন বিষয় উক্ত এবং ব্যক্ত থাকিলেও, সকলের সমন্বয় ব্রহ্মেই, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রমাত্রেরই সমন্বয় সেই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

५। ईक्षतेर्नाशब्दम्।

६। गौणश्चेन्नात्मशब्दात्।

৭। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।

৮। হেয়ত্বাবচনাচ্চ।

৯। স্বাপ্যয়াৎ।

১০। গতিসামান্যাৎ।

১১। শ্রুতত্বাচ্চ।

৫। শ্রুতিতে "ঈক্ষতি"-প্রয়োগ থাকায়, প্রকৃতি বা প্রধান জগতের কারণ হইতে পারে না।

৬। "আত্ম" শব্দ থাকাতে "ঈক্ষণ" শব্দের গৌণার্থ অগ্রাহ্য, মুখ্যার্থই গ্রাহ্য।

৭। শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, আত্মনিষ্ঠই মোক্ষাধিকারী; সুতরাং "আত্মা" শব্দ প্রধান বা প্রকৃতিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

৮। "সৎ" বা "আত্মা" পদে প্রধানকে বুঝায় না; যেহেতু প্রধান বা প্রকৃতির পরিত্যক্ত হইবার কোন বচন নাই।

৯। "আত্মা" প্রধান বা প্রকৃতি হইতে পারে না, যেহেতু জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়।

১০। ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে উপনিষৎসমূহের এক মত।

১১। শ্রুতিতেও স্পষ্ট-উক্তি থাকা-হেতু ব্রহ্মই জগৎ-কারণ, বুঝিতে হইবে। (পঞ্চম হইতে একাদশ পর্যান্ত ছয়টী সূত্র দ্বারা একটী অধিকরণ রচিত।)

(৫ম সূত্র।)—সাংখ্যমতানুসারিগণের মতে জড়া প্রকৃতিই

জগতের কারণ। বৈদান্তিকগণের মতানুমত যে সমস্ত ঔপনিষদী বাক্যাবলী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মকে উদ্দেশ করে, তাহাও তাঁহাদের মতে সত্ত্ব-রজ-তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিতেই অবিরোধে প্রযুক্ত হইতে পারে।

সাংখ্যমতানুসারে পুরুষ বা আত্মা ব্যতীত অন্য সর্ব্ব পদার্থই জড়ের আদিম সত্তা প্রকৃতি হইতে প্রসূত। এই প্রকৃতিই পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রবর প্লেটোর মতানুসারিগণের মতে এক অপ্রত্যক্ষ সুসূক্ষ্ম বিশ্বোপাদান বা বিশ্বপ্রাণ, ইহা হইতেই সর্ব্বভূতের সম্ভূতি।

প্রকৃতি হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি; তদ্দ্বারাই পুরুষ বা জীবাত্মার বহির্জগদ্-জ্ঞান জন্মে। ফলে ভৌতিকতার সূক্ষ্মতম মূল সত্ত্ব—মহত্তত্ত্ব। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই অন্তর্ব্বোধ, অহঙ্কার বা আমিত্বের উদ্ভব। অহঙ্কারই অন্তর্ব্বোধের সত্তা স্বরূপ। ইহাকে মনস্তত্ত্বের মূল তত্ত্ব বা সর্ব্বজীবত্ব তত্ত্বের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে। অহঙ্কার হইতেই ভৌতিক জগতের হেতুভূত পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন। এই সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র হইতেই স্থূল সৃষ্টির মূলসত্তা স্বরূপ পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন। অহঙ্কার হইতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরিক গ্রহণ-বিচারণ-ক্ষম অন্তরিন্দ্রিয় বা মন সমুৎপন্ন।

সাংখ্য-মতে আমিত্ব পদার্থটি ব্যক্তিগত জীবাত্মতত্ত্ব। উহা অনুৎপন্ন ও অনুৎপাদনশীল অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ। উহা কেবল প্রকৃতির দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতি-তত্ত্ব-জ্ঞান হইতেই জীবাত্মার আত্ম-জ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই জীবাত্মা দুঃখমুক্ত হন। প্রকৃতি

জ্ঞানশূন্যা অন্ধশক্তি-স্বরূপিণী, কিন্তু ক্রিয়াময়ী এবং আত্মা অক্রিয়, অসক্ত অথচ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন। এই আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সান্নিধ্যেই এই সর্ব্বভূতাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ সমুদ্ভূত।

এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা উপলক্ষে শাস্ত্রে "অন্ধ-খঞ্জ-গতি"র একটী সুন্দর উপাখ্যান উক্ত হইয়াছে। খঞ্জ, অন্ধের স্কন্ধে চড়িয়া সুস্থ-নেত্রে দিগ্‌দর্শন পূর্ব্বক অন্ধকে চালাইতে লাগিল; অন্ধ, খঞ্জ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সুস্থপদে অভীষ্ট পথে চলিল। এইরূপ অজ্ঞানান্ধ ক্রিয়াশীল প্রধানের সহযোগিতায় নিষ্ক্রিয় জ্ঞানময় পুরুষের অভীষ্ট এই জগৎ-কার্য্য চলিতেছে।

সাংখ্যকার কপিলকথিত পুরুষ বা আত্মাই বৈদান্তিক জীবাত্মা। তবে কিনা, বৈদান্তিকগণ সর্ব্ব আত্মার একত্ববাদী, কিন্তু সাংখ্যানু-সারিগণ তাহাদের চিরপৃথক্‌ত্ববাদী অর্থাৎ বহুজীবাত্মবাদী। বৈদান্তিক মতে উপাধির সসীমত্ব বা সাবয়বত্ব জন্যই আত্মায় আপাত-পার্থক্যবোধ; কিন্তু উপাধির অপগমেই সর্ব্বাত্মার একত্ব-পরিণতি। সাংখ্যবাদী এক অদ্বৈত বিশ্বাত্মসত্তা স্বীকার করেন না; কিন্তু বৈদান্তিক বুঝেন যে, সেই বিশ্বাত্মা হইতেই প্রতি পদার্থ প্রকাশিত, এবং ব্যক্তিগত জীবাত্মসমূহ এই মায়াপ্রপঞ্চ-পরিকল্পিত জগতে আপাত-সত্যরূপে আভাসমান, কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহাদের তথা-বিধ বহুত্ব-সত্ত্ব অসিদ্ধ।

সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অসীম বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা মায়িক উপাধিগত সসীমত্ব ফলে বহুবৎ প্রতীয়মান। যদি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি মূলতত্ত্বের সহিত বেদান্তোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব যোগ

করা যায়, আর তৎসঙ্গে যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, *প্রত্যেক পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মই প্রত্যেক পদার্থ, অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এবং এই প্রত্যেক পৃথক্ প্রতীয়মান জীবাত্মাও সোপাধিক সীমাবচ্ছিন্ন সেই এক ব্রহ্ম, তাহা হইলেই বেদান্তদর্শনের ও সাংখ্যদর্শনের ভিন্নত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

জগদেককারণস্বরূপে স্বীকৃত প্রধান বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার সাধ্য সাংখ্যের নাই। বৈদান্তিক বলেন যে, অন্ধশক্তিময়ী প্রকৃতিতে জগৎকারণত্ব সম্ভাবিত নহে, পরন্তু কোন চৈতন্যসত্ত্বাতেই নিখিল সৃষ্টির মূল কারণত্ব নিহিত। বৈদান্তিক ও সাংখ্য উভয়-মতেই অব্যক্ত প্রাকৃতিক তত্ত্বে জগতের উপাদান-কারণত্ব বর্ত্তমান; কিন্তু নিখিল বিশ্বের নিয়ামিকা বা নায়িকারূপে প্রকৃতির যে প্রকৃষ্ট স্বাধীনসত্তা সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত, বেদান্তে তাহা অস্বীকৃত। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র, ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।

সাংখ্যাচার্য্যগণ উপনিষৎ হইতে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু বৈদান্তিক মতে ঐ সমস্ত ঔপনিষদী বাক্যাবলীর লক্ষ্য সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি নহে, পরন্তু পরব্রহ্মই বটে।

* পঞ্চম সূত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, 'ঈক্ষণ' শব্দ জগৎ-কারণে প্রযুক্ত হওয়ায়, জড়া প্রকৃতি বা প্রধানের জগৎ-কারণত্ব সূচিত হয় না। 'ঈক্ষণ' শব্দ "চিন্তন" অর্থেই উপনিষদে প্রযুক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬-২) দৃষ্ট হয়।———

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীন একমেবাদ্বিতীয়ম্।
তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় তত্তেজোঽসৃজত।"

হে সৌম্য! আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন, তিনি দেখিলেন (চিন্তা করিলেন) আমি প্রজা উৎপাদনার্থে বহু হই। তৎপরে তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। আমরা ঐতরেয় আরণ্যকে (২১। ৪-১-২) দেখিতে পাই "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন্মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা, স ইমাল্লোঁকানসৃজত।" একমাত্র আত্মাই এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। আর নিমেষকারী কিছুই ছিল না। পরে "আমি জগৎ সৃষ্টি করিব" ব্রহ্ম, এই চিন্তা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত এবং আরও অনেক ঔপনিষদী শ্রুতি দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতি বা প্রধান জগৎ-কারণ নহে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু পরমাত্মা পরমেশ্বরই জগৎকারণ।

সাংখ্যবাদী এইরূপ তর্ক করেন যে "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, অতএব জ্ঞান-পদার্থ সত্ত্বগুণাত্মক; এবং প্রকৃতি সত্ত্বাদিগুণময়ী, সুতরাং প্রকৃতি কেননা "সর্ব্বজ্ঞ" আখ্যায় অভিহিতা হইতে পারিবেন? এরূপ স্থলে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যেমন সত্ত্ব প্রকৃতির গুণ, তেমনি রজস্তমও প্রকৃতির গুণ। রজোগুণ প্রবর্ত্তক ও উদ্দীপকরূপে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, তমোগুণ নাশকরূপে ও অন্ধকার-স্বরূপে জ্ঞানাবরক; সুতরাং এতদুভয়ের ক্রিয়া-প্রভাবে প্রকাশক সত্ত্ব অভিভূত হওয়ায়, উহার জ্ঞান-শক্তিও অভিভূতা হয়। অতএব প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞা বলিলে, অল্পজ্ঞাও বলিতে হয়। ফলিতার্থে চৈতন্যসত্তা দ্বারাই জ্ঞানবত্তা প্রমাণিত হয়।

সুতরাং চৈতন্যাভাব বশতঃ প্রকৃতি বা প্রধানে কোন তত্ত্ব-বোধের সাক্ষিত্ব সম্ভবে না। "নাচেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বমস্তি।" আস্তিক-সাংখ্যবাদিগণের অর্থাৎ পাতঞ্জলবাদিগণের মতানুমত এক জগৎ-কর্ত্তার বিদ্যমানতা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি বা প্রধানের জ্ঞান ঈশ্বরেরই জ্ঞান-সাপেক্ষ। যেমন অগ্নিবর্ণ তপ্ত-লৌহগোলকে প্রকাশিত দাহিকা শক্তি, লৌহ-গোলকের প্রতি-পরমাণুময় অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি, তদ্রূপ চৈতন্যময় ঈশ্বরের জ্ঞান-শক্তি অচেতনা প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইতে পারে। লৌহ-গোলকের দাহকতা যেমন অগ্নিরই দাহকতা, তদ্রূপ প্রকৃতির জ্ঞানময়তা বা সর্ব্বজ্ঞতা আত্মা বা ব্রহ্মেরই জ্ঞানময়তা ও সর্ব্বজ্ঞতা মাত্র।

সাংখ্যবাদিগণ আর একটি নূতন তর্ক ধরেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি এক নিত্যজ্ঞান-শক্তি বা সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি ব্রহ্মে বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞাতব্য বস্তুর অধীন হইয়া পড়ে, স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বলা যায় যে, সূর্য্যের রশ্মিপ্রভা যেরূপ সৌরকর-দীপ্ত বা রৌদ্রতপ্ত পদার্থ-সমূহ-সাপেক্ষ নয়, উহা সর্ব্বপদার্থেই নিত্যনিরপেক্ষভাবে স্বয়ম্প্রকাশিত ও স্বতঃ-অনুভূত হয়, সর্ব্ববিষয়-নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞানময়ত্বও তদ্রূপ।

যাহাহউক, যদি তর্কস্থলে ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াভূমিরূপে কোন স্থায়ী বিষয় অঙ্গীকারে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, নাম-রূপাত্মক উপাধিই সেই বিষয়। উহা অব্যক্ত—

অথচ বিকাশোন্মুখ। ('নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে') অথবা অন্য কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, মায়াই সেই বিষয়, যাহা জগদ্বীজরূপ জগৎ-কর্ত্তার জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়াভূমি। ব্রহ্ম স্বয়ং মায়া হইতে ভিন্নও নহেন অভিন্নও নহেন ; অথচ মায়া ব্রহ্মেই বিলীনা বা ব্রহ্মময়ী! এতাবতা সমগ্র বৈদান্তিক সন্দর্ভই ব্রহ্মবাচক, কিন্তু প্রকৃতি বা প্রধান-বাচক নহে।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়াচ॥
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥
স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্য বেত্তা।
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

(অনুবাদ)

কার্য্য বা কারণ নাহিক তাঁহার।
তুল্য বা অধিক কিছু নাহি তাঁর।
বহুরূপে তাঁর শক্তির বিকাশ।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রকাশ॥
অকর-চরণে গ্রহণ-গমন।
অনেত্র-অশ্রোত্রে দর্শন-শ্রবণ॥

তিনি সর্ব্ববেত্তা, তাঁর বেত্তা নাই ;
মহাদিপুরুষ বলে তাঁরে তাই ॥

(৬ষ্ঠ সূত্র)—সাংখ্যবাদী আর এক অভিনব তর্ক উদ্ভাবন করিয়া বলেন যে, জগৎ-কারণত্বে প্রকৃতি বা প্রধানই লক্ষ্য, যেহেতু 'ঈক্ষণ' শব্দ রূপকভাবেই উহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ "অগ্নি চিন্তা করিলেন"—"আপ্ চিন্তা করিলেন" এইরূপ উক্তি-সমূহ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, এবং তত্তৎস্থলে অগ্নি-জল প্রভৃতি ভূত সচেতন-ভাবেই কল্পিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এই সূত্রেই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ জগৎকারণত্ব-নির্দ্দেশস্থলে "সৎ" শব্দ উক্ত হওয়ায়, 'ঈক্ষণ' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত নয়, বুঝিতে হইবে। উক্ত শাস্ত্রোক্তি পূর্ব্বে একবার উদ্ধৃত হইয়াছে "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার সৃষ্টি-বর্ণনান্তে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকাদিকে 'দেবতা' এবং ঐ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাত মূলতত্ত্বকেও "দেবতা" শব্দে নির্দ্দেশ করা হইতেছে ; যথা—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" ঐ দেবতা চিন্তা করিলেন যে, আমি এই জীবাত্মা দ্বারা উক্ত তিন দেবতার মধ্যে প্রবেশ করিব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই প্রথমোক্ত 'দেবতা' পদ কদাপি অচেতন প্রকৃতি বা প্রধানে প্রযুক্ত হইতে পারে না ; কারণ "জীবাত্মা" শব্দের স্বতঃপরিচিত ও পরিগৃহীত অর্থে দেহের পরিচালক এক সজীব ও সচেতন আত্মতত্ত্বই প্রতীত হয়। এবম্ভূত চৈতন্যতত্ত্বে অচেতন প্রধানের সত্তা কদাচ সম্ভাবিত

নহে। ফলে কেবল চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ প্রতীয়মান হইলেই সমগ্র অধ্যায়টির পূর্ণ তাৎপর্য্য পরিষ্কার পরিগৃহীত হয়। তৎপরে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৮-৭) দেখিতে পাই—স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইহাই বিশ্বের মূল সূক্ষ্ম সারতত্ত্ব—সমস্তই সেই আত্মা। সেই আত্মাই সত্য। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাই। এখানেও চৈতন্যস্বরূপ আত্মারই নির্দ্দেশ হইতেছে—অচেতন প্রধানের নহে।

সাংখ্যবাদী পুনরপি একটি নূতন আপত্তি উপস্থিত করেন। সাংখ্যোক্ত দার্শনিক প্রণালী অনুসারে প্রকৃতি-তত্ত্ব পুরুষ কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলেই পুরুষ বা জীবাত্মা মুক্তিলাভ করেন; প্রকৃতি যা প্রধান ভৃত্যবৎ পুরুষের সেবা করেন; এবং প্রভু যেমন প্রিয় ভৃত্যকে "আমার অপর আত্মস্বরূপ" বলিতে পারেন, তদ্রূপভাবে পুরুষের প্রিয়পরিচারিকা প্রকৃতিকে পুরুষের আত্মস্বরূপ বলা যাইতে পারে। পরন্তু সাংখ্যে এরূপ উক্ত হয় যে, "ভূতাত্মা" শব্দে পঞ্চভূত; সুতরাং যেস্থলে জগতের ভৌতিক মূল পদার্থসমূহকেও নির্দ্দেশপূর্ব্বক "আত্মা" পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সে স্থলে সেরূপ ভাবেও প্রধানকে "আত্মা" বলা অসঙ্গত নহে; সুতরাং ঔপনিষদী বাক্যাবলী ব্রহ্ম-বাচিকা না হইয়া প্রকৃতি-বাচিকাই হইবে।

(৭ সূত্র)—সপ্তম সূত্রে উপরোক্ত সাংখ্য-মতবাদ নিরস্ত হইতেছে। আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্বেতকেতু-সম্বন্ধীয় বাক্যে শ্বেতকেতুর ন্যায় একটী চৈতন্যময় জীবকে "তত্ত্বমসি" "তুমি তাহাই" এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং উক্ত 'আত্মা' শব্দে

অচেতন প্রধানকে না বুঝাইয়া, চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে; কারণ চেতন জীবকে অচেতন হওয়ার উপদেশ দেওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে, একটী অনুপেক্ষণীয় অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে অনেক পদ রূপক-ভাবে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে তত্তৎ পদের প্রশস্ত-মৌলিক অর্থ উজ্জ্বলভাবে সঙ্গত হয়, সে ক্ষেত্রে রূপকত্বের আরোপ কষ্টকল্পিত ও অসঙ্গত। পঞ্চভূত সম্বন্ধে 'আত্মা' শব্দ রূপক-ভাবে বা গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ ঐরূপ রূপকার্থ বা গৌণার্থ ভিন্ন উহা নিতান্ত অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। সমগ্র অধ্যায়টীর তাৎপর্য্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এস্থলে উক্ত শব্দটী উহার মৌলিক অর্থে বা মুখ্যার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ, তাঁহারাই মুক্তি-সাধনার বা মুমুক্ষুত্বের অধিকারী, কিন্তু অচেতন প্রধানকে অবলম্বন করিয়া কাহারও কদাপি সে অধিকার-লাভ সম্ভবে না। যাহারা স্বীয় আত্মাকে স্ব-সর্ব্বস্ব করিয়া, পরের আত্মাকে স্বতন্ত্র ও সুদূরস্থ জ্ঞান করে, বিশ্বের সহিত তাহাদের সন্ধি-সংস্থাপন সুদূর-পরাহত। যিনি স্বীয় আত্মাকে অপরের আত্মার সহিত স্থূলতঃ স্পষ্টপার্থক্য-বিশিষ্ট দেখিয়াও, মূলতঃ এক বা অপৃথক্ দেখিতে পারেন, বিশ্বের সর্ব্ব-পদার্থেই তাঁহার সেবার্থ শান্তি-সুধা সঞ্চিত। বিশ্বাত্মতত্ত্বের আশ্রিত হইয়া, তিনি ঐশানুগ্রহে আনন্দ-রাজ্যে বিহার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার সন্দেহজাল ছেদিত, মোহাবরণ অপসারিত, কর্ম্মবন্ধ বিমোচিত হয়; তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব-লাভে কৃতার্থ হন। শাস্ত্র স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে

সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।” ফলে যিনি বিশ্বাত্মায় স্বীয় জীবাত্মা একীভূত বা সমীকৃত উপলব্ধি করিতেছেন, তিনিই “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অধিকারী। এই অধিকারেই যথার্থ মুক্তি বা শান্তি। স্বর্গভোগ-কল্পনা ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।

(৮ সূত্র)—প্রধান যে “আত্মা”-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না, তাহার আর একটি কারণ এই সূত্রে সূচিত হইয়াছে। “অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়” যুক্তিশাস্ত্রের একটি প্রমাণ। সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ ‘বশিষ্ঠ’ নামক একটি বড় তারার নিকটে ‘অরুন্ধতী’ একটি ক্ষুদ্র তারা। আমাদের পুরাণশাস্ত্র অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠের পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূক্ষ্মের পরিচয় স্থূল-পরিচয়-সাপেক্ষ। সুতরাং ক্ষুদ্র তারা অরুন্ধতীকে দেখাইতে হইলে, অগ্রে বৃহত্তারা বশিষ্ঠের প্রদর্শন আবশ্যক। অর্থাৎ প্রথমতঃ বশিষ্ঠই যেন অরুন্ধতী, এই ভাবে বশিষ্ঠের প্রদর্শন ব্যতীত তৎপার্শ্ববর্ত্তিনী ক্ষুদ্রতমা প্রকৃত-অরুন্ধতীর প্রদর্শন সুসাধ্য নহে, সুতরাং অরুন্ধতী-দর্শনের উহাই প্রণালী। অতএব এই “অরুন্ধতী দর্শন” রূপ ন্যায়-প্রমাণ অনুসারে বলা যাইতে পারে যে, সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বের নির্দ্দেশার্থ অগ্রে স্থূল প্রকৃতিতত্ত্ব নির্দ্দেশ আবশ্যক। এই জন্য প্রকৃতি বা প্রধানকে অগ্রে “আত্মা” বলিয়া, পরে যথার্থ আত্মা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায়। ফলিতার্থে কিন্তু এ ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ-নক্ষত্রবৎ প্রধানের প্রথম-নির্দ্দেশ এবং অরুন্ধতীবৎ ব্রহ্মের পশ্চাৎ-নির্দ্দেশ হয় নাই; অর্থাৎ প্রধানকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হয় নাই।

এই সূত্রে 'চ' (ও) শব্দ একটি অতিরিক্ত কারণ-সূচনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি প্রধানকে পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িক-প্রমাণ-মতে বশিষ্ঠস্থানীয় ধরা যায়, তাহা হইলেও তৎপ্রতি 'আত্ম' পদ-প্রয়োগ বিসদৃশ হইয়া উঠে। অধ্যায়-প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে, কারণের পরিজ্ঞানে প্রতিবস্তুই পরিজ্ঞাত হয়। শ্বেতকেতুকে তৎপিতা বলিলেন—"উত তমাদেশমপ্রাক্ষীঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" অর্থাৎ—তুমি কি কদাপি সেই উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছ, যদ্দ্বারা আমরা অশ্রুত বিষয় শুনিতে, অবুদ্ধ বিষয় বুঝিতে ও অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারি? তখন পুত্র সেই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং পিতা উত্তর করিলেন—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎ-পিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ—"হে সৌম্য। একটি মাত্র মৃৎপিণ্ড-জ্ঞানেই সকল মৃণ্ময় বস্তুর পরিজ্ঞান হয়। ব্যবহারিক জগতে মৃত্তিকার বিবিধ বৈকারিক গঠন-ভেদে সংজ্ঞাবাক্যের ভেদ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বে যে—মাটি সেই মাটি! যিনি মাটিকে জানেন, তিনি মাটির দ্বারা গঠিত সর্ব্বদ্রব্যই জানেন; অথবা যেখানে যেভাবে যে আকারেই পরিণত হউক্ না কেন, তিনি মাটিকে চিনিবেনই। মৃৎ-পাত্র ভাঙ্গিলে আবার মৃত্তিকাতেই পরিণত হয়, অতএব মৃণ্ময়ের তুলনায় মূল মৃত্তিকাই নিত্য ও যথার্থ; আর মৃণ্ময়ের আকারগত বিভিন্ন মৃদ্বিকার ব্যবহারিকজগতে সত্য হইলেও তত্ত্বতঃ অনিত্য ও অযথার্থ।

অতএব জগতের যদি একটি মাত্র মূলকারণ হয় এবং তাহা পরি-

জ্ঞাত হয়, তবে জাগতিক প্রতিবস্তুই পরিজ্ঞাত হইবে। এ ক্ষেত্রে উৎপাদক—কারণই কেবল যথার্থ, কিন্তু উৎপন্ন কার্য্য অযথার্থ। সমগ্র অধ্যায়টীতে ইহাই অবিতর্কিত ভাবে সূচিত হইতেছে যে, মূল কারণ পরিজ্ঞাত হইলে, সকল কার্য্য পদার্থই পরিজ্ঞাত হয়, সে স্থলে 'আত্মা' পদে যদি প্রধানকে বুঝায়, তবে প্রধানকে জানিলে সমস্তই জানা যাইতে পারে ; কিন্তু সাংখ্য-মতেই প্রধান-জ্ঞান সহ পুরুষ-জ্ঞান লাভ হয় না ; কারণ পুরুষ প্রধানের বিকার নহে। অতএব জগদেককারণ 'আত্মা' বা 'সৎ' শব্দে প্রকৃতি বা প্রধানকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

(৯ম সূত্র)—অবশেষে ৯ম সূত্রে আর একটি নবযুক্তি অনুসারে দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃতি বা প্রধান উপনিষৎ-প্রযুক্ত 'আত্মা" পদের বাচ্য হইতে পারে না। এই সূত্র সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, যে স্থলে জীবের চরম ও পরম গতি আত্মা, সে স্থলে প্রধান কখনও সেই আত্মা হইতে পারে না। এই সূত্রে আমাদের অন্তর্ব্বোধ বা জ্ঞানের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা সূচিত হইয়াছে। ঐ ত্রিবিধ অবস্থায় আত্মতত্ত্বকে জাগরিত অন্তর্ব্বোধ, স্বপ্নশীল অন্তর্ব্বোধ ও সুষুপ্ত অন্তর্ব্বোধ বলা যায়।

জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা, মনন দ্বারা বাহ্যজগতের বিষয়-বৈচিত্র্যে সম্বদ্ধ থাকে। উহাতে আত্মার উপাধি কল্পিত হয়। এই প্রকারে এই অনিত্য বাহ্য স্থূল জড় দেহেতেই আত্মবুদ্ধি জন্মে। আত্মার স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যবিষয়-সম্বন্ধ দেহাধীনত্ব ছাড়াইয়া কেবল অন্তরিন্দ্রিয়ে বা মনে সংস্কাররূপে নিবদ্ধ থাকে, এবং এইরূপে

মনেই আত্মবুদ্ধি জন্মে। অবশেষে যখন স্বপ্নের নিবৃত্তি হয়, তখন আত্মায় গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি আসে এবং আত্মা পূর্ণাত্ম-স্বরূপে নিমজ্জিত বা বিলীন হয়। যখন কেহ গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হয়, তখন, সে যে সুগভীর সুখ-নিদ্রায় সুনিদ্রিত ছিল, এ অন্তর্বোধ স্পষ্ট অনুভব করে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ-লেশ-শূন্য অবস্থায়ও অন্তর্বোধ বা জ্ঞান অন্তর্হিত হয় না। যদি সুষুপ্তি-সময়ে অন্তর্বোধের অভাব থাকিত, তবে জাগ্রদবস্থায় বিগত সুষুপ্তি-সম্ভোগের জ্ঞান আমরা কোথায় পাইতাম ? এতাবতা আত্মার সহিতই 'আত্মা'র সঙ্গতি সিদ্ধান্তসিদ্ধ হইতেছে। এই আত্মা কদাচ প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পারে না ; কারণ প্রকৃতি বা প্রধান কেবল বাহ্যজ্ঞানের বিষয় মাত্র। সচেতন আত্মা কখনও অচেতন প্রকৃতিতত্ত্বে লীন হইতে পারে না।

(১০ সূত্র)—দশম সূত্রে উক্ত হইতেছে যে, সমগ্র ঔপনিষদী শ্রুতিই একবাক্যে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। এ বিষয়ে যদি প্রকৃতি বা প্রধান-বাচিকা কোন শ্রুতি উপনিষদে থাকিত, তবে অপরাপর শ্রুতির সহিত তাহার অর্থ সামঞ্জস্য-সম্পাদনের সুসঙ্গত উপায়ও থাকিত। সে যাহা হউক্, ফলে সমগ্র উপনিষদেরই সর্ব্ব-শ্রুতি-সমন্বিত সার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই বিশ্বের মূল কারণ। আমরা এইরূপ শ্রুতি দেখিতে পাই,—'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।' (তৈঃ উঃ ৩৩), "আত্মন এবেদং" [ছাঃ উঃ ৭ ২৬] "আত্মন এষঃ প্রাণো জায়তে।" [প্রঃ উঃ ৩৩] অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন,

আত্মা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন, আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন ইত্যাদি। ফলে এই মর্ম্মের বচন-পরম্পরা সমস্ত উপনিষদেই দৃষ্ট হইবে।

(১১শ সূত্র)—একাদশ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিতে সুস্পষ্ট ও সরলভাবে "ব্রহ্মই বিশ্ব-কারণ" এই মহাতত্ত্ব ও মহাসত্য ঘোষিত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৬৯) বলেন,—"স কারণং সৎ করণাধিপাধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ" অর্থাৎ তিনিই কারণ, তিনিই ইন্দ্রিয়েশ্বরেশ্বর; তাঁহার কেহই জনয়িতা বা প্রভু নাই। অতএব যাঁহারা প্রধানকেই শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জগৎ-কারণ-রূপে প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক-বিচারাদি সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন।

১২। **আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।**

১৩। **বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ।**

১৪। **তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ।**

১৫। **মান্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে।**

১৬। **নেতরোঽনুপপত্তেঃ।**

১৭। **ভেদব্যপদেশাচ্চ।**

১৮। **কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা।**

১৯। **তস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি।**

১২ হইতে ১৯ সূত্র পর্য্যন্ত একটি অধিকরণ।

১২। ব্রহ্ম-বোধার্থে "আনন্দ" পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হেতু "আনন্দময়" আত্মাই পরমাত্মা।

১৩। "আনন্দময়" পদের "ময়" প্রত্যয়টি বিকারার্থে প্রযুক্ত নহে, পরন্তু প্রাচুর্য্য বা পূর্ণত্ব অর্থেই প্রযুক্ত।

১৪। "আনন্দময়" পদের "ময়" পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত, যেহেতু ব্রহ্মই আনন্দের মূল কারণ বলিয়া উক্ত।

১৫। আনন্দময়ই ব্রহ্ম ; কারণ বেদের মন্ত্রভাগে যে ব্রহ্ম বর্ণিত, ব্রাহ্মণ-ভাগেও সেই ব্রহ্মই গীত।

১৬। ব্যক্তিগত জীবাত্মাও ইহার লক্ষ্য নহে ; কারণ তাহাতে সিদ্ধান্তপক্ষে অনুপপত্তি উপস্থিত হয়।

১৭। পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য উক্ত থাকায়, তল্লক্ষণানুসারে "আনন্দময়" কদাপি জীবাত্মা নহেন।

১৮। আনন্দময়ে ইচ্ছার অস্তিত্ব উক্ত হওয়ায়, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ-সিদ্ধান্তও অপ্রতিপন্ন।

১৯। আনন্দময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন শ্রুতি-সিদ্ধান্তসম্মত।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন, পঞ্চকোষগত ভাবে আত্মা, পঞ্চভাবেই লক্ষিত হন, যথা অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় ; অর্থাৎ অন্নগত আত্মা, প্রাণবায়ুগত আত্মা, মনোগত আত্মা, বুদ্ধিগত আত্মা ও আনন্দগত আত্মা। যদিও অন্ন-পরিণত দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই চারিটীই আত্মার বাহ্য পরিচ্ছদ, কিন্তু আমাদের মোহমুগ্ধ চিত্তের স্বভাবই এই যে, আমরা ঐ সমস্তকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা সর্ব্বদা আত্মার যন্ত্রস্বরূপ অন্তর্বোধকেই ভ্রমবশতঃ আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। ফলে আনন্দময়ই প্রকৃত আত্মা।

আনন্দময় কোষাত্মক আত্মাই পরব্রহ্ম, অথবা অন্নময়াদি কোষাত্মক আত্মার ন্যায় তাহা হইতে কিঞ্চিদ্বিভিন্ন, এই বিষয়ের বিচারই ১২শ সূত্রের বিষয়। ফলে পরমাত্মার নির্দ্দেশ সূচনায় "আনন্দ" পদ পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায়, ইহা পরব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র নহে।

"আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (তৈঃ উঃ ৩।৬) ইত্যাদি ঔপনিষদী শ্রুতি এবং এইরূপ সমতাৎপর্য্যসূচিকা অন্যান্য শ্রুতিও "আনন্দ" পদে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছেন। মানুষ সাধারণতঃ অন্নময় স্থূল শরীর বা মনোময় সূক্ষ্ম শরীরকেই অসাধক অবস্থায় আত্মা বলিয়া বুঝিয়া বসে, সুতরাং ঔপনিষদী শিক্ষাও মানব-প্রকৃতির স্বত অনুগতি অনুসারে ক্রমশঃ সাধককে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উপনীত করে। ঔপনিষদী বাক্যাবলী ব্রহ্মরহস্য-ভেদিনী, ব্রহ্মবিদ্যাবোধিনী বা ব্রহ্মবার্ত্তা-বাহিনী; সাধককে তাহার স্ববোধানুরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব উপহার দেওয়াই তাঁহার কার্য্য; সুতরাং মানবীয় অধিকার ক্রমের অনুবর্ত্তনে তিনিও ব্রহ্ম-বোধন-বিষয়ে আদৌ স্থূল জড়াত্মা হইতে আরম্ভ করেন। যদিও উহা বাস্তব আত্মা নহে, তথাপি স্থূল ভেদ করিয়া সূক্ষ্মে সঞ্চরণই আত্মানু-সন্ধানের ক্রম। সুতরাং স্থূল হইতে ক্রমে স্থূলাল্পতরে বা ক্রমসূক্ষ্মে অগ্রসর হইতে হইতে চরম পরিণামে সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ীভূত ভাবেই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র অরুন্ধতী-নক্ষত্রকে দেখাইতে হইলে, তৎপার্শ্ববর্ত্তী বশিষ্ঠ নামক একটী উজ্জ্বল বড় নক্ষত্রকে (তাহাই যেন অরুন্ধতী,

এই ভাবে) অগ্রে দেখাইয়া, পরে তন্নিকটস্থ যথার্থ অরুন্ধতী-বিন্দু দেখাইতে হইবে।

যদি প্রতিপক্ষবাদী এইরূপ তর্ক উপস্থিত করেন যে, "তস্য প্রিয়-মেব শিরঃ" আনন্দই তাঁহার মস্তক, ইত্যাদি বাক্যে আনন্দময় পর-মাত্মা নির্দ্দেশিত হইতে পারেন না, কারণ তিনি হর্ষ-বিষাদের অস্পৃশ্য বা অতীত। এ স্থলে তদুত্তর-স্বরূপ এই বলা যায় যে, উহা কেবল সৌষ্ঠব-রক্ষার্থ রূপক-কল্পনা মাত্র। এই আনন্দময় আত্মতত্ত্বেও একটী শরীর বা কোষ আরোপিত হইয়াছে। যেহেতু বেদান্তোক্ত ঐ সমস্ত কোষ বা শরীর-পরম্পরার অন্যতম-রূপেই এই আনন্দময়-কোষও কল্পিত হইয়াছে। উক্ত কোষ-পরম্পরার আরম্ভ অন্নময়কোষে, অর্থাৎ অন্ন-পরিণাম-গঠিত ভৌতিক শরীরে এবং চরম বা পরম পরিণতি এই আনন্দময় বা প্রকৃত আত্মময়-কোষে।

১৩শ সূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে, যদিও অন্নময়, প্রাণময় ইত্যাদি পদে 'ময়'-প্রত্যয় বিকারার্থেই প্রযুক্ত বুঝায়, কিন্তু আনন্দময়ের "ময়" পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত। ব্রহ্ম আনন্দময়, কারণ অনন্ত আনন্দেই তাঁহার সর্ব্বময় সত্তার সংপূর্ণতা। শ্রুতি বলেন "পূর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম"।

১৪শ সূত্রে ইহাই সুব্যক্ত যে,—"আনন্দময়" শব্দের "ময়"-প্রত্যয় পূর্ণার্থকই বটে, যেহেতু শ্রুতি "এষ হ্যেবানন্দয়তি" প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মকেই আনন্দের মূল উৎস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব যিনি আনন্দমূলাধার, আনন্দের অভাব বা অপূর্ণতা তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে ? তিনি স্বরূপলক্ষণে পূর্ণানন্দসত্তাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৫শ সূত্রে অপর একটী যুক্তিবাদ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "আনন্দময়" পদে ব্রহ্মই বাচ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।১) বলিতেছেন—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ব্রহ্মজ্ঞ জন পরমকে প্রাপ্ত হন। তৎপরের মন্ত্রেই বলিতেছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। অতঃপর শ্রুতি বুঝাইয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্ব এই ব্রহ্ম হইতে বিকাশিত। তৎপর অধিকতর সমীচীন ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধনার্থে "অন্নময়কোষ" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিজ্ঞানময়-কোষ" পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বের বাহ্য চতুঃস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশেষে মন্ত্রে যে ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই পরব্রহ্মই ব্রাহ্মণে "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞান-ময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত বাহ্য চতুষ্কোষাত্মক আত্মা হইতে অতিক্রান্ত বা অতীত অন্তরাত্মা আনন্দময়-কোষাত্মক, এই বলিয়া গীত হইতেছেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উভয় ভাগের বাক্যাবলীই পরব্রহ্ম-প্রমাণিকা।

যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে, পরবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মাতি-রিক্ত অন্যবিধ আত্মা আভাষিত হইয়াছেন, তবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হয়; কারণ তাহা হইলে শ্রুতিবাক্যের মূল আলোচ্য বিষয়টিই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়; তাহা হইলে এস্থলে শ্রুতিকে এক নূতন অভিধেয়-বিষয়াবলম্বিনী বলিতে হয়। ফলে আনন্দময় আত্মাতিরিক্ত অন্য অন্তরাত্মার অস্তিত্বই অসিদ্ধ; অতএব আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম।

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।

আনন্দই ব্রহ্ম, ইতি তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
আনন্দ-সম্ভূত সর্ব্বভূত সুনিশ্চয়॥
আনন্দে সঞ্জাত ভূত, আনন্দে জীবিত।
চরমে পরমগতি আনন্দে মিলিত॥
ব্রহ্মবিদ্যা এই বিদ্যা "ভার্গবী বারুণী।"
পরম-ব্যোমেতে হন প্রতিষ্ঠিতা ইনি॥

অর্থাৎ যিনি ভৃগুবরুণের উপরোক্ত এই আনন্দ-ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বিজ্ঞাত হন, তিনি পরব্যোমে (অন্তরাকাশে, ফলিতার্থে অন্তরাত্মায়) প্রতিষ্ঠিত হন। এতাবতা "আনন্দময়" আত্মাই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম।

১৬শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, "আনন্দময়" আত্মা ব্যক্তিগত জীবাত্মা নহেন। শ্রুতি বলেন—"**সোঽকামযত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।**" (তৈঃ উঃ ২।৬)

'বহু হ'য়ে জনমিব' এই ইচ্ছা করি,
আত্মতপে তপ্ত হ'য়ে সগুণত্ব ধরি,
এ সমস্ত যাহা কিছু—(অখিল ভুবন)
স্বইচ্ছায় ইচ্ছাময় করিলা সৃজন।

এই বিশ্ব-সৃষ্টি-বিধায়িনী শক্তির অসাধারণ স্বাভাবিক বিশেষত্ব পরমাত্মা ব্যতীত কোন সোপাধিক জীবাত্মায় সম্ভবে না।

১৭শ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, নিরুপাধিক পরমাত্মা ও সোপাধিক জীবাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য শ্রুতিবাক্যে সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট থাকায়, পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মা কদাপি "আনন্দময়" আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন না। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।৭) বুঝাইতেছেন যে, "আনন্দময়" আত্মা রসস্বরূপ; সেই রসাস্বাদ-সাধনাতেই জীবের আনন্দলাভ হয়। অতএব সেই আস্বাদিত বা বিদিত রসস্বরূপই পরমাত্মা এবং আস্বাদক বা বেত্তাই জীবাত্মা। যদিও তত্ত্বতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন, তথাপি যতদিন অবিদ্যা ও অজ্ঞতা বিদূরিত না হয়, ততদিন পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথগ্‌রূপেই প্রতীত হন। সুতরাং জীবাত্মা অবাধ অখণ্ড সত্য-গৌরবে পরমাত্মা হইতে পরমার্থতঃ অভিন্ন হইলেও, জীবের মায়া-মোহভ্রান্তির ক্ষান্তি পর্য্যন্ত প্রভিন্ন প্রতীয়মান হইবেই। ১৬শ ও ১৭শ—উভয় সূত্রেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য সুপ্রচারিত হইয়াছে।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যেস্থলে "ইচ্ছাবত্তা দ্বারাই ব্রহ্মের সগুণত্ব এবং তাহাই বিশ্বসৃষ্টির মূল-কারণ-তত্ত্ব, সেস্থলে ব্রহ্মই "আনন্দময়" হইতে পারেন, কিন্তু সাংখ্যোক্ত ইচ্ছাদিবৃত্তি-শূন্যা অচেতনা জড়া প্রকৃতি বা প্রধান কদাচ হইতে পারে না।

শ্রুতি বলেন,—"**সোঽকামযত বহুস্যাং প্রজায়েয়**" (তৈঃ উঃ ২।৬) জড়া প্রকৃতিতে কামনা সম্ভবে না, উহা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেই

সম্ভবে। যদিও শ্রুতিবাক্য-বিচারে সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎ-কারণত্ববাদ ইতঃপূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাও তদুদ্দেশ্য-পোষক একটি অতিরিক্ত যুক্তিবাদ বলা যাইতে পারে।

১৯শ সূত্রের তাৎপর্য্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, "আনন্দময়" আত্মা প্রধানও হইতে পারেন না, ব্যক্তিগত জীবাত্মাও হইতে পারেন না। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবাত্মা "আনন্দময়" পরমাত্মার সম্মিলন লাভ করেন।

শ্রুতি বলেন,—

"যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি, যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" (তৈঃ উঃ ২। ৭)

অশরীর, অনির্দ্দেশ্য, অদৃশ্য ও অবিশেষ্য
আত্মায় অভয়-স্থিতি যার,
সেই ত অভয় পায়; বিন্দু-ভেদ-বোধে হায়!
ভয়ের কারণ ঘটে তার।

দ্বৈতজ্ঞানের রাজ্যেই এই ভয়ের অধিকার। দ্বৈতজ্ঞানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়েরও তিরোধান হয়; কারণ তখন কে আর কাহাকে ভয় করিবে? এক্ষণে কথা এই, ইতঃপূর্ব্বেই যখন প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সাংখ্যমতানুসারেও প্রধানের সহিত জীবাত্মার চির-পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট, তখন এতদুভয়ের অভিন্নত্ব বা একত্ব একান্তই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। অতএব যখন শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জীবাত্মা ও আনন্দময় আত্মার অভিন্নত্ব বা সম্মিলন

সিদ্ধান্তসিদ্ধ হইয়াছে, তখন উক্ত "আনন্দময়" আত্মা অবশ্য পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন।

উপরি-উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য দ্বারা তাৎপর্য্যতঃ ইহাই অববোধিত হয় যে, যিনি অখণ্ড সাম্য-জ্ঞান দ্বারা "আনন্দময়" আত্মায় আত্ম-সমর্পণ করেন, তিনিই তৎসহ অভেদ-মিলন-লাভে মোক্ষপদের অধিকারী হন।

জীবাত্মা আর কিছুই নহে, উপাধ্যবচ্ছিন্ন পরমাত্মা। যেমন "ঘটাকাশ"—ঘট ভাঙ্গিলেই মহাকাশ, তেমনই জীবোপাধি বা জীবত্বঘট ভাঙ্গিলেই জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত বা প্রলীন।

অজ্ঞ জনেরা স্বভাবতঃ এই ভয়ে ভীত হয় যে, পাছে তাহাদের জীবাভিমান-সর্ব্বস্ব ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' টুকু হারাইয়া যায়! তাহার সান্ত ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' টুকুরই যেন অস্তিত্ব আছে, আর অনন্তস্বরূপতাই যেন অস্তিত্বশূন্যতা বা শূন্যে বিলীনতা। জীবনের দৈনন্দিন সামান্য ব্যাপারেও মানব, উদার সমবেদনা ও উন্নত লক্ষ্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়া থাকে এবং তাহার বিপরীত ভাব বা ব্যবহারকে হেয়জ্ঞান করে। অতএব এরূপ ধারণা বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয় যে, মানবের আত্মোন্নতি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সীমায়ই আবদ্ধ থাকিবে, উহা চরম ও পরম লক্ষ্যে পঁহুছিবেনা। তোমার সংকীর্ণ আমিত্বের গণ্ডী ভেদ কর, সত্যস্বরূপ পরমাত্মার উদার আশ্রয় অবলম্বন কর। তোমার ব্যক্তিগত আমিত্ব বা আত্মস্বরূপ ভঙ্গপ্রবণ; উহা অচিরেই ভগ্ন হয়; কিন্তু সত্য কখনও ভগ্ন হয় না; অতএব সত্যের শরণ লও—সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। তোমার সর্ব্বস্বক্ষয়ের হেতু তোমার ক্ষুদ্র আমিত্বে

নিহিত। বিশ্বসাম্য-সাগরে তোমার ক্ষুদ্র আমিত্ব বিসর্জ্জন কর, অর্থাৎ বিশ্বাত্মায় আত্মসমর্পণ কর; আর শোক-মোহ-ভয়ের ভয় থাকিবে না। ইহাই নিত্যানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ; ইহা অনন্ত— অক্ষয়।

২০। अन्तस्तद्धर्म्मोपदेशात्।

২১। भेदव्यपदेशाच्चान्यः।

২২। आकाशस्तल्लिङ्गात्।

২৩। अतएव प्राणः।

২৪। ज्योतिश्चरणाभिधानात्।

২৫। छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्पण-निगदात्तथाहि दर्शनं।

২৬। भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवं।

২৭। उपदेश-भेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्।

২৮। प्राणस्तथानुगमात्।

২৯। न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्।

৩০। शास्त्रदृष्ट्यातूपदेशो वामदेववत्।

৩১। जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्।

২০ ও ২১ সূত্র একটি, ২২ সূত্র একটি, ২৩ সূত্র একটি ও ২৪ হইতে ২৭ সূত্র একটি ও ২৮ হইতে ৩১ সূত্র পর্য্যন্ত একটি অধিকরণ।

২০। ব্রহ্মের লক্ষণ-নির্দ্দেশ থাকায়, আদিত্য ও অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

২১। ভেদের ব্যপদেশ থাকায়, আদিত্যাদি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন।

২২। ব্রহ্মের লক্ষণ থাকায় "আকাশ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৩। ঐরূপে (পূর্ব্বসূত্রোক্ত কারণে) 'প্রাণ' পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৪। "চরণ" শব্দের উল্লেখ থাকায় "জ্যোতিঃ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৫। "ছন্দ"—অভিধান ব্রহ্ম-বাচক নহে বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ ; কারণ ছন্দ দ্বারা ব্রহ্মাভিমুখে চিত্ত পরিচালিত হয় এবং এরূপ প্রয়োগ শ্রুত্যন্তরেও পরিদৃষ্ট হয়।

২৬। ভূতাদি কারণস্বরূপ উল্লিখিত হওয়ায়, "গায়ত্রী" পদ ব্রহ্ম-বাচক হইলেই উপপত্তি-সিদ্ধ হয়।

২৭। ভেদ-হেতু ব্রহ্ম লক্ষ্য হইতে পারে না বলিয়া যে আপত্তি, তাহা অসঙ্গত, কারণ তাহাতে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

২৮। যাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে, তদ্দারাই প্রমাণিতব্য যে "প্রাণ" পদ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

২৯। বক্তার স্বীয় আত্মাকে উদ্দেশ করা হেতু, ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তর এই যে, বহু স্থানে "প্রাণ" শব্দ-প্রয়োগে ব্রহ্মকেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৩০। শাস্ত্রদৃষ্টি-হেতুই ইন্দ্রের "অহং ব্রহ্ম" উক্তি বামদেবের উক্তির ন্যায় বুঝিতে হইবে।

৩১। জীব এবং প্রাণের লক্ষণ থাকায়, ব্রহ্মবোধকত্ব অনুপপন্ন, এই আপত্তি অসঙ্গত; কারণ অন্যরূপ অর্থ করিলে, প্রথমতঃ ত্রিবিধ উপাসনার প্রয়োজন হয়; দ্বিতীয়তঃ যে অর্থ করা হইয়াছে, অন্য শ্রুতিপরম্পরাতেও সেই অর্থ দৃষ্ট হয়; তৃতীয়তঃ ইহাতে ব্রহ্ম-লক্ষণও ব্যক্ত।

এই সমস্ত সূত্রে উপনিষদে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ বা পদ-বিশেষের অর্থগত বিচার-বিতর্ক মীমাংসিত হইয়াছে। "আকাশ" ও "প্রাণ" শব্দ পরমাত্মবোধক হইয়াই তৎপর্য্যায়শব্দ-রূপে উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে; অথচ উক্ত শব্দদ্বয়ে ভৌতিক আকাশ ও ভৌতিক প্রাণবায়ু বুঝায়; অতএব উহা বিচার-বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

(২০শ ও ২১শ সূত্র)—ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১৬। ৬) নিম্নস্থ বাক্যাবলী দৃষ্ট হয়;—

"अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेश आप्रनखात् सर्व्व एव सुवर्णः। तस्य यथा कप्यासं, पुण्डरीकमेवमक्षिणी, तस्योदिति नाम, स एव सर्व्वेभ्यः उदित, उदेति ह वै सर्व्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद इत्यधिदैवतं अथाध्यात्ममथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते।"

হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্যে অধিষ্ঠিত।
কেশ-শ্মশ্রু হয় তাঁর হিরণ্যমণ্ডিত॥

পদনখ পর্য্যন্ত সমস্ত স্বর্ণময়।
অরুণারবিন্দ সম শোভে নেত্রদ্বয়॥
"উৎ" অভিধানে তিনি অভিহিত হন।
যেহেতু সর্ব্বপাপের ঊর্দ্ধে তিনি রন॥
এই তত্ত্ব অবগত আছেন যে জন,
তিনিও পাপের ঊর্দ্ধে অবস্থিত হন।
ইতি তত্ত্ব দেবপক্ষে; অধ্যাত্ম-পক্ষেতে,
সে পুরুষ দৃষ্ট অন্তরক্ষি-দর্পণেতে।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, যিনি আদিত্যাসনে ও অন্তর্নয়নে অধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মা ব্রহ্ম, না তিনি অপর কোন পরমপূজাস্পদ পুরুষবিশেষ।

পরমাত্মা "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কঃ উঃ ১৩। ১৫) শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও ক্ষয়রহিত। তিনি নিরাধার—আত্মমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত ও নিত্য। যথা—

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি স্বে মহিম্নি আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।" (কঃ উঃ ২৭২৪)

এই সমস্ত এবং অপরাপর ঔপনিষদী উক্তি সমূহ দ্বারাও ইহা ব্যক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা সর্ব্বোপাধিপরিশূন্য। অতএব বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত পুরুষ এই নিরুপাধিক ব্রহ্ম-লক্ষণান্বিত না হইয়াও কিরূপে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন? এতদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে—"য

আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ উঃ ৮ ৭। ১) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পাপাতীত পরমাত্মসত্তারই অববোধ হইতেছে; সুতরাং বিচার্য্য স্থলেও উক্ত আদিত্যাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষের পাপাতীতত্ব স্পষ্ট পরিব্যক্ত থাকায়, উহা দ্বারা সেই "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণান্বিত নির্গুণ-তত্ত্ব-বর্ণন স্থলে তাঁহাকে "নিরুপাধিক" বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উপাস্য-স্বরূপে তাঁহার তটস্থ-লক্ষণান্বিত সগুণতত্ত্ব শ্রুতি-সিদ্ধান্ত-সম্মত। যদিও প্রকৃতপক্ষে অরূপ ব্রহ্ম তাঁহার স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তথাপি এস্থলে সাধকের ধ্যান-ধারণার উপযোগিতা বিধানার্থ আদিত্যাসনে ও অক্ষি-দর্পণে তাঁহার স্বরূপসত্তা কল্পিত হইয়াছে। নেত্রের বিষয় রূপ, রূপের মূলতত্ত্ব তেজঃ, তেজের মূলতত্ত্ব আদিত্য; অতএব উপাসকের ধ্যান-ধারণাধিগম্য-ভাবেই সগুণ ব্রহ্ম হিরণ্ময় পুরুষরূপে তৈজসাধিষ্ঠানে কল্পিত। শাস্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

সর্ব্বময় নিরাধার ব্রহ্মের আকার ও আধার কল্পনা ভিন্ন উপাসনাই অসম্ভব হয়। পরবর্ত্তী ২১শ সূত্রে এই তত্ত্বই সিদ্ধান্তসিদ্ধ হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৩ ৭ ৯) অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ।

আদিত্য-আধারে, আদিত্য-অন্তরে,
অধিষ্ঠান হয় যার,
যার পরতত্ত্ব না জানে আদিত্য,
আদিত্যই তনু তার।
আদিত্য-অন্তরে রহি যেবা করে
আদিত্যেরে নিয়মিত ;
আদিত্যস্থ সেই আত্মরূপী এই—
অন্তর্যামী নিত্যামৃত।

উদ্ধৃত বাক্যে আদিত্যোদ্দীপক আত্মা পুরুষ যে পরমাত্মা নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই আপাততঃ অববোধিত হয় ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বৃহদারণ্যকোক্ত এই অন্তর্যামী পুরুষই ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত আদিত্যাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যদিও পরমাত্মা প্রতি জীবাত্মারই মূলতত্ত্ব, তথাপি উপাধির অধিকার-কালাবচ্ছিন্নভাবে সর্ব্ব জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্রবৎ সুপ্রতিপন্ন।

(২২শ সূত্র)—ছান্দোগ্য উপনিষৎ (১৭৯) বলিতেছেন, যথা—

“अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्व्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त इत्याकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणं इति।

কিবা হয় মূলতত্ত্ব এই জগতের ?
উত্তর—আকাশ হয় মূলতত্ত্ব এর।
যেহেতু আকাশ হ'তে সর্ব্বভূতোদয় ;
আকাশেই হয় পুনঃ সর্ব্বের বিলয়।

সর্ব্বভূত হ'তে হয় আকাশ মহান্;
আকাশেই সবের পরম পরিণাম।

এখানে "আকাশ" পদে পরমাত্মাই বোদ্ধব্য; যেহেতু ব্রহ্মের লক্ষণ-বিশেষত্ব এখানে বিস্পষ্ট ব্যক্ত। সমুদয় উপনিষদেরই ইহা অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বভূতের সম্ভূতি; অতএব উপরোক্ত ছান্দোগ্যবাক্যে আকাশকেই যখন সর্ব্বভূতের সমুদ্ভাবক মূল কারণ বলা হইয়াছে, তখন উক্ত "আকাশ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। উহা ভৌতিক আকাশ নহে; কারণ ভৌতিক আকাশ স্বয়ংই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাৎ বায়ু র্বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদি (তৈঃ ভঃ ২)

এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল উৎপন্ন,—ইত্যাদি। এতদ্রূপ অন্যান্য ঔপনিষদী শ্রুতিতেও "আকাশ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা"। (ছাঃ উঃ, ৮।১৫) আকাশই নামরূপের প্রকাশক। এ উক্তিতে ব্রহ্ম-লক্ষণই লক্ষিত।

"ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।" (**ঋগ্বেদ** ১—১৬৪। ৩৯) ক্ষয়-লয়-রহিত পরম ব্যোমে বেদসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও দেবসমূহ অধিষ্ঠিত।

"সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা" (তৈঃ উঃ ১।৬)। ভৃগু বরুণের এই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা পরম ব্যোমে

প্রতিষ্ঠিতা।” ওঁ কং ব্রহ্ম, ওঁ খং ব্রহ্ম। ব্রহ্মই ক, ব্রহ্মই খ বা আকাশ। (ছাঃ উঃ ৪ ১০।৫)

(২৩শ সূত্র) ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—“**সর্ব্বাণি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে।**” এই সমস্ত ভূতই প্রাণে নিমজ্জিত, প্রাণে সমুদ্ভূত এবং প্রাণেই শ্বাস-সঞ্জীবিত। এ উক্তিও ব্রহ্ম লক্ষণেরই বিশেষত্ব-বিজ্ঞাপনী। এতাবতা পূর্ব্ব-সূত্রানুসারিণী মীমাংসা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, “আকাশ” পদ যেরূপ ব্রহ্মবোধক, এই “প্রাণ” পদও সেইরূপ ব্রহ্মবোধক, ভৌতিক বায়ুবোধক নহে।

২৪শ হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত যে “জ্যোতি” পদ আলোচিত হইয়াছে, উহার অর্থও সাধারণ ভৌতিক জ্যোতি নহে; ঐ পদও পরব্রহ্মপ্রজ্ঞাপক। এতদ্বিচারবিষয়ীভূতা উক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩। ১৩৭) এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

“**অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ।**

যে আলো বিকাশে এই আকাশ-উপর।
মহল্লোক-সর্ব্ব হ’তে যাহা মহত্তর॥
যাহার অতীত আর নাহি অন্য লোক।
পুরুষের অন্তর্জ্যোতি এই সে আলোক॥

এ স্থলে “জ্যোতি” শব্দে সামান্য ভৌতিক আলোক বুঝাইতেছে না, পরন্তু সর্ব্বান্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রসমূহের সিদ্ধান্তে আদিত্যাসনে ও অক্ষিদর্পণে অধিষ্ঠিত হিরণ্ময়-পুরুষসত্তা যদ্রূপ ব্রহ্ম-বোধক, বক্ষ্যমাণ সূত্রনিচয়ে "জ্যোতি" পদও তদ্রূপ ব্রহ্মবোধক।

অপর, "গায়ত্রী" পদের প্রয়োগেও ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞাপিত। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং।" (৩-২ ১২) এই সমস্ত ভূতই গায়ত্রী, অথবা গায়ত্রীই সর্ব্বভূতাত্মিকা।

এই অধিকরণে ইহাও প্রকাশিত যে, এই সমস্তই তাঁহার মহত্ত্ব; ইহার অতীত মহত্তর তত্ত্বই পরম পুরুষ। তাঁহার একপদে সর্ব্ব-ভূতসত্তা; অমৃতস্বরূপ অপর ত্রিপাদ ত্রিদিবে প্রতিষ্ঠিত। যথা—"**एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य सर्व्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।**" অতএব "ত্রিপাদ" পদের উল্লেখেই বুঝিতে হইবে, সূত্রোক্ত "জ্যোতিশ্চরণ" পদ পরব্রহ্ম-প্রজ্ঞাপক; সুতরাং এ জ্যোতি সামান্য ভৌতিক জ্যোতি নয়; ইহা সমগ্র ভৌতিক বিশ্বের বিধাতা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের চতুষ্পাদ বা চতুরংশ উক্ত হইয়াছে। ইহার ত্রিপাদ অমৃতত্ব-প্রতিষ্ঠ এবং অবশিষ্ট চতুর্থ পাদে এই মায়িক জগৎ সৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচ্য, বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই যেস্থলে ব্রহ্ম, সেস্থলে "জ্যোতি" পদে ব্রহ্ম না বুঝিয়া, সাধারণ আলোক মাত্র বুঝিলে, আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক নূতন বিষয়ে অবতরণরূপ মহাভ্রমে পতিত হইব; যেহেতু অধ্যায়টী একান্তই ভৌতিক জ্যোতিঃ-প্রসঙ্গ-শূন্য। ব্রহ্মই এস্থলে "জ্যোতি" রূপে উক্ত হইয়াছেন; কারণ তিনিই সর্ব্বজ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

অর্থাৎ

তিনি জ্যোতি—সর্ব্বজ্যোতি তাঁরি অনুসৃত।
তাঁহারি বিভায় এই বিশ্ব বিভাসিত।

ধর্ম্মভাবের ক্রম-বিকাশ-ক্ষেত্রে কার্য্যফলকেই মূল কারণরূপে কল্পনা করা বিরল নহে। আকাশেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থিতি, সুতরাং অজ্ঞানাবস্থায় নিম্নাধিকারী মানব আদৌ আকাশকেই ভৌতিক জগতের মূল কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তৎপরে ক্রমে সাধনোন্নতি সহকারে সে ভ্রমের অপনোদন হইল, মানব জগতের যথার্থ মূলকারণের যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইল; তখনও সেই কার্য্য-ফলের অভিধানেই প্রকৃত কারণকে অভিহিত করিতে লাগিল। এইরূপেই মানব-সমাজে একদা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ভৌতিক সূর্য্যই জগৎ-প্রসবিতা "সবিতা" নামে জগৎ-কারণ-রূপে গৃহীত ও পূজিত হওয়ার পরে, সেই সবিতার সবিতা পরম কারণের যথার্থ জ্ঞান-লাভ হইলেও 'সূর্য্য' শব্দেই তাঁহার অভিধান অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল। ব্রহ্মের "আকাশ" "জ্যোতি" "প্রাণ" প্রভৃতি অবান্তর অভিধানের এই ভাবে উৎপত্তি। সূর্য্যের ন্যায় কোন কোন সময়ে আকাশ, জ্যোতি, প্রাণ-বায়ু প্রভৃতিই জগৎ-কারণ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল; পরে কালে মানব-জ্ঞানের উচ্চাধিকার-ফলে যখন সূর্য্যের সূর্য্য, আকাশের আকাশ, জ্যোতির জ্যোতি, প্রাণের প্রাণ পরমব্রহ্মের পরম-জ্ঞান-লাভ হইল। তখন

মানব, ঐ সমস্তকে এক-মাত্র মূল কারণের কার্য্য জানিয়াও, কার্য্য-পরিচয়ের সহিত কারণ-পরিচয় সম অভিধানে অভিন্নরূপে প্রচলিত রাখিল। আলোচ্য সূত্রসমূহে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, উপনিষদে যদিও ভৌতিক সংজ্ঞায় পরমাত্মা অভিহিত হইয়াছেন, তথাপি তত্ত্বার্থতঃ ইহা অভ্রান্তরূপেই অববোধিত হয় যে, উক্ত ভৌতিক •সংজ্ঞা-সকল ব্রহ্ম-বোধক, পরন্তু নামানুরূপ বাস্তব ভৌতিক-সত্তা-বোধক নহে।

২৫শ সূত্র পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের সমর্থক ও তাৎপর্য্য-পোষক মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের টীকায় উল্লিখিত "গায়ত্রী" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত, কিন্তু বৈদিক ছন্দোবিশেষ নহে। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং" এই শ্রৌত বাক্যই বিচার-বিষয়ীভূত। অনন্তর গায়ত্রী, পৃথিবী, শরীর, অন্তঃকরণ, বাক্য, নিশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ ভৌতিক তত্ত্বে বর্ণিত হইতেছে। তৎপর এইরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে যে, গায়ত্রীর চতুষ্পাদ ও ষড়্ ব্যাহৃতি বা বিভাগ আছে। সর্ব্বশেষে আমরা এই বাক্য প্রাপ্ত হই যে, এ সমস্ত তাঁহারই মহিমা স্বরূপ। এখানে 'গায়ত্রী' শব্দ বৈদিক ছন্দোমাত্রকেই বুঝাইতে পারে না, কারণ উহা কেবল কতিপয় শব্দ-বিশেষ বা বর্ণ-বিশেষের সমষ্টি মাত্র; সুতরাং উহা কদাপি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব "গায়ত্রী" শব্দ বিস্পষ্ট ব্রহ্ম-বাচক। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে. বিবিধ নাম-রূপ-উপাধ্যবচ্ছিন্ন ভাবে সগুণ স্বরূপে ব্রহ্ম বিবিধ সাধকের উপাস্য হইয়া থাকেন; অতএব "গায়ত্রী" শব্দের উল্লেখ কেবল ছন্দোগীত গায়ত্রীর তত্ত্বার্থবলে ব্রহ্মের প্রতি চিত্তের

রতি-গতি-সম্পাদনার্থই হইয়াছে। অপর, অন্যরূপ সরল ভাবেও গায়ত্রীকে ব্রহ্মবোধিকা বলা যাইতে পারে ; কারণ ষড়্ব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী চতুষ্পদী এবং ব্রহ্মও চতুষ্পাদ।

২৬শ সূত্রের নির্দ্ধারণ এই যে, গায়ত্রী ব্রহ্ম-বাচিকা না হইয়া মাত্র ছন্দোবাচিকা হইতে পারে না ; কেননা, তাহা হইলে শাস্ত্র যে পৃথিবী, শরীর, অন্তঃকরণ, বাক্য ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ভৌতিক সত্তাই তাঁহার "চরণ" রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। সমস্ত অধ্যায়ের মূল বিষয় ব্রহ্ম, সুতরাং "সর্ব্বভূতাত্মিকা গায়ত্রী" এরূপ উক্তিতে ব্রহ্ম-লক্ষণ সূচিত হওয়ায়, উহা তত্ত্বার্থতঃ ব্রহ্মই বটে, কিন্তু সামান্য ছন্দোবিশেষ নহে।

২৭শ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, যেস্থলে পূর্ব্বোক্ত শ্রৌত বাক্যে (তাঁহার অমৃত-তত্ত্বাত্মক পাদত্রয় আকাশে প্রতিষ্ঠিত) আকাশ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান-রূপে বর্ণিত এবং পরবর্ত্তী শ্রৌত বাক্যে (সেই জ্যোতি আকাশের ঊর্দ্ধে উদ্ভাসিত) আকাশ ব্রহ্মের অব্যবহিত সীমান্তরূপে কথিত হইয়াছে, সেস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য কিরূপে তাৎপর্য্যতঃ পরবর্ত্তীর সহিত সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতে পারে ? যেহেতু একতঃ 'আকাশ' ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, অন্যতঃ আকাশ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী মাত্র ! এতদুত্তরে বলা যায়, যথা একটি বাজপক্ষী "তরুশিরের উপরে" দৃষ্ট হইতেছে বলাও যাহা, "তরুশিরে" দৃষ্ট হইতেছে বলাও তাহাই। অতএব প্রকৃতপক্ষে যে ব্রহ্ম "আকাশের অতীত বা ঊর্দ্ধস্থ" তাঁহাকে "আকাশস্থ" বলিলেও বিরোধ-বোধ কষ্ট-কল্পনা মাত্র ; ফলিতার্থে উহাতে বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।

২৮ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, "কৌষিতকীব্রাহ্মণ"—উপনিষদে ব্যবহৃত "প্রাণ" শব্দ ব্রহ্মবাচক বা ভৌতিক প্রাণ-বায়ু-বাচক? পূর্ব্বোক্ত ২১ সূত্রের বিচারিত বিষয়ের সহিত ইহা সমবিষয়ীভূত। নিম্নোক্তরূপ বাক্যাবলী "কৌষিতকী ব্রাহ্মণ"—উপনিষদে দৃষ্ট হয়, যথা—

দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দনকে ইন্দ্র কহিলেন, "আমিই প্রাণ—আমিই চিদাত্মা; জীবনস্বরূপ—অমৃতস্বরূপ আমাতে ধ্যানপরায়ণ হও।" প্রাণই গৌণতঃ চিদাত্মা, আনন্দ, অবিনশ্বর অমৃতরূপে উক্ত। এ স্থলে অমৃতত্ব, চিদাত্মকত্ব, আনন্দ ইত্যাদি ব্রহ্মেরই বিশেষ লক্ষণ-সমূহ প্রাণে আরোপিত হওয়ায়, "প্রাণ" পদ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুরই বাচক হইতে পারে না।

২৯শ সূত্রের বিচার্য্য বিষয় এই যে, যখন ইন্দ্র বলিয়াছেন, "আমিই প্রাণ, আমি চিদাত্মা," ইত্যাদি, তখন তদ্বাক্য ব্রহ্ম বা পরমাত্ম-প্রতিপাদক কিরূপে হইতে পারে? এতদুত্তরে বলা যায়, একই অধ্যায়ে যে স্থলে ঐরূপ ব্রহ্ম-নির্দ্দেশের বহুত্ব দৃষ্ট হয়, সে স্থলে "প্রাণ" পদও তদ্রূপেই ব্রহ্ম-বিনির্দ্দেশক হইয়াছে। যদি এ উত্তর সন্তোষ-জনক না হয়, তবে ৩০শ সূত্রানুসারে এই উত্তর-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইন্দ্র যেখানে স্বায় উক্তিতে স্বীয় ব্রহ্ম স্বরূপতাই ব্যক্ত করিতেছেন, সেখানে শ্রুত্যুক্ত বামদেব ঋষির ব্রহ্ম-পরিণতিবৎ স্বীকার করিতে হইবে। যখন কাহারও সমাধি-সিদ্ধি-ফলে অবিদ্যার অপগম হয়, তখন তাঁহার জীবাত্মা, পরমাত্মা ব্রহ্মের সহিত একীভূত উপলব্ধ হয়; তখন সেই সিদ্ধ পুরুষ "সোঽহং"

মহাবাক্যের অধিকারী হন ; যেহেতু "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি" "ব্রহ্ম জানে যে, ব্রহ্ম হয় সে।" যখন ইন্দ্র বলিলেন, "আমিই প্রাজ্ঞ আত্মা" ইত্যাদি, তখন তিনি আত্ম-ব্রহ্মত্বই প্রচার করিলেন ; অতএব ইহাতে অণুমাত্র অসঙ্গতি নাই।

৩১শ সূত্রের মীমাংসিতব্য বিষয় এই যে, উদ্ধৃত ঔপনিষদী শ্রুতিপরম্পরায় ব্যক্তিগত জীবাত্মা ও প্রাণ-বায়ু প্রভৃতিরও প্রাকৃতিক লক্ষণাবলী লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং তদ্দ্বারা তত্তৎ সত্তার সপ্রমাণতা সঙ্গত না হইয়া পরব্রহ্ম-প্রমাণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? উত্তর এই যে, সমগ্র অধ্যায়টি ব্রহ্মতত্ত্বেই সমাহিত, অতএব যদি উপরোক্ত শ্রৌত বাক্যাবলীর অর্থ ভৌতিক প্রাণবায়ু প্রভৃতি রূপেই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে একব্রহ্ম-সাধকের উপসনাগত ধ্যান-ধারণাদির ত্রিধা বিভক্ত বিষয় কল্পিত হইয়া পড়ে, যথা—জীবাত্মা, প্রাণবায়ু এবং ব্রহ্ম ; সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অতীব অসঙ্গত বা অনুপপন্ন, সন্দেহ নাই। একাভিধেয়-লক্ষিত একটি মাত্র বাক্যে তিনটি বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার কল্পনা অসম্ভব। যাহাহউক, পূর্ব্ব-প্রদর্শিত-মতে এই সমস্ত শ্রৌত বাক্যের অর্থই ভাবান্তরে পরিগৃহীত হইয়াছে। অতএব ইহা সিদ্ধান্তসিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্ম-লক্ষণের বিশেষত্বই বিস্পষ্ট ব্যক্ত হওয়ায়, ভৌতিক "প্রাণ" ইত্যাদি কদাচ ব্রহ্ম পরিবর্ত্তে পরিগৃহীত ও প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পাদ।

১। সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধোপদেশাৎ।

২। বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ।

৩। অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।

৪। কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ।

৫। শব্দবিশেষাৎ।

৬। স্মৃতেশ্চ।

৭। অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ।

৮। সম্ভোগ-প্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ।

এই ৮টী সূত্রে একটী অধিকরণ রচিত।

১। "মনোময়" ই যে ব্রহ্ম, ইহা সর্ব্বোপনিষৎ-প্রসিদ্ধ।

২। "মনোময়"এর যে সমস্ত গুণ বিবৃত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলেই উপপন্ন হয়।

৩। "মনোময়"এর গুণাদি জীবাত্মায় প্রযুক্ত হইলে, অনুপপত্তি-দোষ ঘটে।

৪। কর্ম্ম ও কর্ত্তার ব্যপদেশ থাকাতেও "মনোময়" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

৫। শব্দের প্রভেদ থাকাতেও "মনোময়" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

৬। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারাও উহাই প্রতিপাদ্য।

৭। অধিষ্ঠান ও আকারের ক্ষুদ্রত্ব-বিষয়িণী আপত্তির উত্তর এই যে, আকাশবৎ ব্রহ্ম চিন্তনীয়।

৮। তত্ত্বতঃ জীব-ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও, ব্রহ্মের বিশেষত্ব হেতু জীবের ন্যায় ব্রহ্মের সম্ভোগপ্রাপ্তি হয় না।

প্রথমসূত্র ও তৎপরবর্ত্তী সপ্ত সূত্র, ছান্দোগ্য-উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ১৪শ প্রপাঠক অবলম্বনে রচিত। উক্ত প্রপাঠকের বিষয় "শাণ্ডিল্য-বিদ্যা" নামে সাধারণতঃ অভিহিত। উহাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"सर्व्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति। शान्त उपासीत। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्व्वीत। १

এই সমস্তই ব্রহ্ম—ব্রহ্মেতে জনিত।
ব্রহ্মে বিমজ্জিত বিশ্ব—ব্রহ্মেই পালিত॥
শান্ত সমাহিত চিত্তে সাধন যাহার।
ব্রহ্মের উপাসনায় অধিকার তা'র॥
মানব কর্ম্মের জীব—কর্ম্মবশে সৃষ্ট।
ইহজন্ম-কর্ম্ম পরজন্মের অদৃষ্ট॥
অতএব কর্ম্মফলবিধানজ্ঞ যাঁরা।
শাস্ত্রমর্ম্ম জেনে কর্ম্ম করিবেন তাঁরা॥ ১

অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কাহাকে বলা যায়?—যিনি নিরতিশয় মহৎ। (বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম) সেই ব্রহ্মেই এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে। (তজ্জলানিতি—তজ্জঞ্চ—তল্লঞ্চ—তদনঞ্চ—তজ্জলান্—অবয়বলোপশ্ছান্দসঃ। সেই ব্রহ্ম হইতে জাত "তজ্জং"—তাঁহাতে লীন "তল্লং"—তাঁহাদ্বারা রক্ষিত-

'তদনং'। তস্মাৎ জাতং তস্মিন্ লীয়তে, তস্মিন্নেব স্থিতিকালে অনিতি প্রাণিতি ইতি।) জিতেন্দ্রিয়—জিতচিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে চিত্তে ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তাঁহার উপাসনা, এইজন্যই মানবকে "ক্রতুময়" বলে। ইহলৌকিক কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক অদৃষ্টফল নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব কর্ম্মফলজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রাদিদৃষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।

যথাক্রতু যথা অস্য পুরুষস্য ক্রতুঃ। প্রেত্য—মরণানন্তরং—স ক্রতুং কুর্ব্বীত, এবং জানন্ ক্রতুং কুর্ব্বীত ইত্যর্থঃ।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ।২

মনোময় জ্যোতিরূপ, সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ,
প্রাণদেহ, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা যিনি।
সর্ব্বকাম, সর্ব্বাবাস, সর্ব্বরস, সর্ব্ববাস,
অবাকী ও অনাদর ব্রহ্ম হন তিনি॥ ২

সেই ব্রহ্ম মনোময়—অর্থাৎ মনঃপ্রায়। (যদ্দ্বারা মনন করা যায়, তাহাই মন; কিন্তু মন যখন কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত, তখন আত্মাও প্রবৃত্তবৎ উপলব্ধ হন; এইরূপে আত্মা মনের ন্যায় প্রতীয়মান হন বলিয়াই মনঃপ্রায়—সুতরাং "মনোময়"। তিনি প্রাণশরীর—অর্থাৎ প্রজ্ঞাশরীর (**যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা, স প্রাণ, ইতিশ্রুতিঃ**)

তিনি চৈতন্যস্বরূপ (ভা দীপ্তিশ্চৈতন্য-লক্ষণং) তিনি সত্যসঙ্কল্প, তিনি আকাশাত্মা—অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম—রূপাদিবিহীন এবং সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তাঁহারই কার্য্য। (স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তেতি শ্রুতেঃ) তিনি সর্ব্বকাম—(ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মীতি—গীতা।) তিনি সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস, (রসোঽহমপ্সু—পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ, ইত্যাদি—গীতা) তাঁহাদ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি অবাকী (বাক্য এস্থলে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বোধক রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি-বিরহিত—অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ) তিনি অনাদর, অর্থাৎ কোন বস্তুতে তাঁহার আদর বা অনুরাগ নাই।

"এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বাসর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বাশ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ" ॥২

ব্রীহি যব-সর্ষপ বা শ্যামাশস্য-কণ,
সব হ'তে অণু মম অন্তরাত্মা হন।
পৃথিবী-আকাশ-স্বর্গ—বিশ্বচরাচর,—
সব হ'তে মম অন্তরাত্মা বৃহত্তর ।৩

এ স্থলে অধিক কিছু বলিবার নাই। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" শ্রুতির এই ব্রহ্মতত্ত্বোক্তিই এই শাণ্ডিল্য-উপদেশে ব্যক্ত হইয়াছে। অতি সূক্ষ্ম ও অতি বৃহৎ, উভয়ই উপলব্ধির অযোগ্য। ব্রহ্মতত্ত্ব এত সূক্ষ্ম—যে অনুভবে আসে না, এবং এত বৃহৎ—যে ধারণাই হয় না।

सर्व्वकर्म्मा सर्व्वकामः सर्व्वगन्धः सर्व्वरसः सर्व्वमिदमभ्यात्तोऽबाक्यनादर एष म आत्मान्तर्हृदय एतद्ब्रह्मैतमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न बिचिकित्सास्तीति च स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः। ४

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস সর্ব্বঘ্রাণ,
এ বিরাট্ বিশ্বব্যাপী যিনি।
অবাকী ও অনাদর, আমার হৃদয়েশ্বর
পরাৎপর পরমাত্মা তিনি।
এ দেহের পরিহারে, অবশ্য পাইব তাঁরে,
এ দৃঢ় বিশ্বাস যার হয়।
শাণ্ডিল্যের উক্তি সার, স্বকর্ম্মের ফলে তার
ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে নিশ্চয়। ৪

২য় উক্তির ব্যাখ্যাস্থলে "অবাকী" ও "অনাদর" পদের তাৎপর্য্য আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তৎপুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব। অন্যান্য অংশ পদানুবাদেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, আশা করি। "শাণ্ডিল্য" পদের দ্বিরুক্তি-প্রয়োগ কেবল গৌরব-প্রকাশক বা আদরার্থক মাত্র। যদিও ব্রহ্ম এস্থলে "মনোময়" ইত্যাদি পদে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তথাপি সমগ্র প্রপাঠকটিই ব্রহ্ম বা পরমাত্ম-প্রাসঙ্গিক, পরন্তু জীবাত্ম-প্রাসঙ্গিক নহে। এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মে যেখানে মনের বা প্রাণের অস্তিত্ব অসিদ্ধ, (যথা—মুঃ উঃ ২—১।২) সেখানে উপরোক্ত শ্রৌত বাক্য ব্রহ্মবাচক হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং উহা জীবাত্মবাচকই বটে।

এস্থলে উত্তরপক্ষে ইহাই বক্তব্য যে, ব্রহ্মতত্ত্বই যেস্থলে মূল বিচার্য্য বিষয়, সেস্থলে নববিষয়ান্তরের আলোচনা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। অপিচ চিত্ত-শুদ্ধি-সাধনের একমাত্র উপায় স্বরূপ উপাসনা ও ধ্যান-ধারণার বিষয় ব্রহ্মতত্ত্বই এস্থলে ব্যক্ত বা বিবৃত, পরন্তু উপাসনাদির অবিষয় জীবাত্মতত্ত্ব কদাচ নহে। সমগ্র বৈদান্তিক সন্দর্ভের সারভূত সিদ্ধান্তই এই যে, ব্রহ্মই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণ এবং ব্রহ্মতত্ত্বের এই অসাধারণ বিশেষ লক্ষণ এখানেও বিস্পষ্ট ব্যক্ত।

২য় সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত বৈদান্তিক উক্তিতে যে সমস্ত লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলেই সুসঙ্গত ও সদুপপন্ন হয়, কিন্তু জীবাত্মায় তৎসমুদায়ের প্রয়োগ কল্পনা করিলে, উহা অতীব অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হয়, সন্দেহ নাই।

এ স্থলে এইরূপ লক্ষণাদি বিবৃত হইতেছে, যথা—ইনি পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, ইনি শস্যকণা হইতে সূক্ষ্মতর, ইনি সর্ব্বকর্ম্মা, ইনি সর্ব্বকাম, ইত্যাদি। এ সমস্ত ব্রহ্মেরই লক্ষণ। ব্রহ্মই "অণোরণীয়ান্—মহতো মহীয়ান্।" ব্রহ্মেই অবাধিত বিশ্বকর্ত্তৃত্ব ও বিশ্বকারণত্ব নিহিত। ব্রহ্মেই বিশ্বের সত্তা, ব্রহ্মেই বিশ্বের সমাধান। ব্রহ্মই বিশ্ব। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

তুমিই পুরুষ, তুমিই রমণী।
তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী।
তুমিই প্রাচীনরূপে দণ্ডপাণি,
তুমিই সর্ব্বত্র সর্ব্ব-জন্মধারী।

এতাবতা দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মার বিশেষ লক্ষণাবলী পরমাত্মায়ও প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার বিশেষ লক্ষণাবলী কদাচ জীবাত্মায় প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মুণ্ডকোপনিষদের উক্তিমতে পরমাত্মা অমনঃপ্রাণসত্ত্ব, শুদ্ধ, শান্ত ইত্যাদি বটে, কিন্তু উহা তাঁহার নির্গুণ-সত্তার স্বরূপ লক্ষণ, আর তাঁহার সগুণ-সত্তার তটস্থ লক্ষণে তিনি সগুণ জীবাত্মার সর্ব্বলক্ষণ-সমন্বিতই বটেন। অতএব জীবাত্মার লক্ষণে পরমাত্মা লক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু পরমাত্মার লক্ষণে জীবাত্মা কদাচ লক্ষিত হইতে পারেন না।

৩য় সূত্র।—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণিত লক্ষণাবলী ব্রহ্মেই প্রযোজ্য এবং এই বর্ত্তমান ৩য় সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত লক্ষণাবলী জীবাত্মায় অপ্রযোজ্য—অনুপপাদ্য। যেহেতু—"আকাশাত্মা" "সর্ব্বকর্ম্মা" "সর্ব্বব্যাপী" প্রভৃতি বিশেষণ উপাধ্যবচ্ছিন্ন সসীম সগুণ জীবাত্মায় কদাচ সম্ভাবিত নহে। যদি বলা যায় যে, পরমাত্মা ত জীবদেহেও অবস্থিত; তদুত্তর এই যে, তাহা হইলেও, তিনি কেবল মাত্র জীব-দেহেই অবস্থিত নহেন, তিনি সর্ব্বস্থিত। "পৃথিবী হইতে বৃহত্তর" "আকাশ হইতে বৃহত্তর" "সর্ব্বাধার" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই ব্যক্ত, কিন্তু জীবাত্মার অস্তিত্ব দেহ বা

উপাধি-অবচ্ছিন্নই বটে ; সুতরাং জীবাত্মা কদাচই উক্ত উক্তিসমূহের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না।

৪র্থ সূত্র।—"মনোময়" ইত্যাদি বিশেষণে এ স্থলে জীবাত্মা লক্ষিত হইতে পারেন না ; কারণ তাহা হইলে বিষয়-বিষয়িভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। প্রথম সূত্রের আলোচনায় এইরূপ ঔপনিষদী উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—"ইনিই সেই ব্রহ্ম" "ইহলোকান্তরে আমি ইহাকে প্রাপ্ত হইব" ইত্যাদি। এই "ইনি" কে ? "ইনি" যদি জীবাত্মা হন, তবে ইহাকে পাইবে যে, সে আবার কে ? যে প্রাপক, সে-ই প্রাপ্য হইবে কিরূপে ? পূর্ব্বোক্ত "মনোময়" ইত্যাদি বিশেষণের বিষয়ীভূত বস্তুকে "আমি পাইব" এরূপ উক্তি জীবাত্মার ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে ? অদ্বৈত-তত্ত্বে পরমার্থতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার (প্রাপ্য-প্রাপকের) একত্ব সিদ্ধ হইলেও "শাণ্ডিল্যবিদ্যার" লক্ষ্যীভূত সগুণ ব্রহ্মোপসনাস্থলে দ্বৈততত্ত্বেই উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধরূপে পরমাত্মা—জীবাত্মার (প্রাপ্য-প্রাপকরূপে) পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। অতএব উপাসক জীবাত্মাই ইহ-লোকান্তরে সেই "মনোময়" "প্রাণ-শরীর" "আকাশাত্মা" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্য উপাস্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তসিদ্ধ হইতেছে।

৫ম সূত্র।—পরমাত্মা ব্রহ্মই যে উপসনার বিষয়, তাহা অপর একটি হেতুতে প্রতিপন্ন হইতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১০ – ৬৮।২) এই ভাবের উক্তি দৃষ্ট হয় যে,—"তণ্ডুল বা যবশস্য-কণার তুল্য কিম্বা শ্যামাক-শস্য বা শ্যামাকতণ্ডুল-তুল্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-রূপে এই

হিরণ্ময় পুরুষ আত্মায় অধিষ্ঠিত” ইত্যাদি। এ স্থলে “আত্মা” পদ অধিকরণ-কারক-রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে, উহা জীবাত্মবাচক এবং কর্তৃপদ “হিরণ্ময়” প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্য পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেছেন। অতএব জীবাত্মাতে পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত, এই তাৎপর্য্য-বোধনার্থ কারকার্থ-ভেদে স্পষ্টতঃইশ ব্দ-বিভিন্নতায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

৬ষ্ঠ সূত্র।—কেবলমাত্র শ্রুতি বা বেদই জীবাত্মা ও পরমাত্মার পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদ প্রতিপাদন করেন নাই; পরন্তু স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতাশাস্ত্রেও (১৮—৬১) উক্ত-হইয়াছে, যথা—

“ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥”

অর্জ্জুন! ঈশ্বর হ’য়ে সর্ব্বভূত-হৃদিগত।
মায়ায় ঘুরান সবে কলের পুত্তলি মত॥

বস্তুতঃপক্ষে কোন আত্মাই পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৩—৭২৩) এইরূপ বলেন——

দ্রষ্টা কেহ নাহি আর সেই এক ভিন্ন।
সেই এক ভিন্ন আর শ্রোতা নাহি অন্য॥

ফলে যদি আমরা অদ্বৈতবাদের কৈবল্যতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, আমরা “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের অধিকারী হইতে পারি, তবেই আমরা উক্ত তত্ত্বোপলাভে শক্ত হই। কিন্তু যাবৎ আমরা উক্ত চরম-পরমার্থ-সত্য-সম্বোধে সমর্থ না হই, তাবৎ আমাদিগের নিকট

সর্ব্ব-সারতম সত্য এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর প্রভিন্ন; স্রষ্টা ও সৃষ্ট স্ব স্ব সত্তায় স্বতন্ত্র! আকাশ অনন্ত, ঘটাদিরূপ উপাধির বশে উহা "ঘটাকাশ" প্রভৃতি অভিধানে সান্তরূপে প্রতিপন্ন। যতদিন ঘট, ততদিন ঘটাকাশ; যেই ঘটের অস্তিত্ব হত, সেই ঘটাকাশ মহাকাশগত! মনের সগুণত্ব, দেহের সাবয়বত্ব এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যগত সান্তত্ব ইত্যাদির সমষ্টিই উপাধি। এই উপাধিই অনবচ্ছিন্ন অনন্ত আত্মার সান্তত্ব-সাধক অবচ্ছেদ। বস্তুতঃ তোমাতেও যে আত্মা, আমাতেও সেই আত্মা। আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদিই এস্থলে ঘটতুল্য। এই ঘট সম্পূর্ণ ভাঙ্গিতে পারিলে— অর্থাৎ সাধন-বলে মানসেন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহ পর্য্যন্ত নিরস্ত করিয়া সিদ্ধি-সমাধি লাভ করিতে পারিলে, আমাদের জীবাত্মরূপ ঘটাকাশ পরমাত্মরূপ মহাকাশে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই।

ভেদ-বোধ বিদূরিত হউক্, জীবাত্মার প্রসার প্রবর্দ্ধিত হউক্, সর্ব্বভূতাত্মায় জীবাত্মার আত্মসমর্পণ হউক্, তখন কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ম্!"

ভেদ-বুদ্ধির নিরাকরণার্থে কর্ম্ম ত্যাগের প্রয়োজন নাই, সাংসারিক কর্ত্তব্য-অবহেলারও আবশ্যকতা নাই, অথবা (তথাকথিত) বৈরাগ্যাবলম্বনেরও কোন বিশিস্ট কারণ নাই। সব দিক্ বজায় রাখিয়াই "আমিত্বের প্রসার" চলে এবং তদ্দ্বারাই উক্তরূপ ভেদবোধ নিরাকৃত হয়। তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছার অধীনতায় সমর্পণ কর, তোমার সঙ্কীর্ণ স্বার্থসমূহের উপসংহার কর, তোমার

সমগ্র কর্ত্তব্য ভেদ-বোধ-নিরাকরণে বা আমিত্বের সম্প্রসারণে কেন্দ্রীভূত কর। ইহাই যথার্থ যোগ-সাধন।

অনেক লোক মোক্ষসাধনার্থী হইয়া কেবল অন্ধকারে লম্ফ প্রদান করেন। তাঁহারা অনেকেই নানারূপ দৈহিক তপস্যা দ্বারা দেহকে কষ্ট দিয়াই মোক্ষাধিকার লাভের আশা করেন; কিন্তু ওরূপ ধারণা ও সাধনা সমীচীন নহে। মোক্ষার্থী মানব যথাবিহিত "শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে" নিরত রহিবেন ও পূর্ণপরার্থপরায়ণ হইবেন।

উপনিষদের জ্বলন্ত সত্যসমূহ স্বীয় জীবনে জীবন্ত ও জাগ্রত কর; বেদান্ত-বিচারে নিযুক্ত রও, বেদান্তবিজ্ঞানে আসক্ত হও। ফলে যতদিন তুমি পরার্থে স্বার্থ বিসর্জ্জন অথবা পর-আমিত্বে আত্ম-আমিত্বের সম্প্রসারণ না করিতে পারিবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। "আমিত্বের প্রসার" সাধনেই তোমার সঙ্কীর্ণ জীবাত্মসত্তা বিশ্বব্যাপী পরমাত্মসত্তায় উৎসর্গীকৃত হইবে, এবং তাহা হইলেই তোমার উপাধি ঘট ভাঙ্গিবে। তোমার সোপাধিক আত্মরূপী ঘটাকাশ নিরুপাধিক পরমাত্মরূপ মহাকাশে পরিণত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

৭ম সূত্র।—"আত্মা আমার অন্তরস্থ, আত্মা শস্য-কণা হইতে সূক্ষ্ম" ইত্যাদি বাক্যে যে আত্মার ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশিত হইতেছে, সে আত্মা কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পারেন?" এইরূপ তর্কোক্তি উপস্থিত হইলে, তদুত্তরে এই বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সান্ত বা ক্ষুদ্র পদার্থকে আবার "সর্ব্বব্যাপী" বলা হইয়াছে কিরূপে? ফলে

নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপীকে সান্ত অবচ্ছেদাত্মক ভাবেও স্থলবিশেষে উপলক্ষিত করা যাইতে পারে। উহা কেবল সাধকের ধারণায়ত্ত করিবার অনুকূলতা মাত্র।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শাণ্ডিল্য-বিদ্যার ১ম উক্তিতেই ব্রহ্মের ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। স্বরূপ লক্ষণে নির্গুণ ব্রহ্ম ধারণাতীত; কিন্তু তটস্থ লক্ষণে সগুণ ব্রহ্মই ধ্যান-ধারণাধিগম্য—অতএব উপাস্য। ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিরাজিত—সুতরাং হৃদয়েও উদিত। অতএব হৃদয়স্থ অন্তরাত্মরূপে তাঁহার উপাসনায় কোন অসঙ্গতি বা আপত্তির অবকাশ নাই। এই জন্যই ব্রহ্ম আকাশাত্মা; অনন্ত বিস্তারিত আকাশ ধারণাতীত হইয়াও ঘটাকাশরূপে সান্ত, আয়ত্তীভূত ও ধারণাধিগত।

৮ম সূত্র।—৮ম সূত্রের আলোচ্য বিষয় এই যে, যদি ব্যক্তিগত আত্মা জীব ও পরমাত্মা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ একই হন, তবেত ব্রহ্মেরও কর্ম্মফল-ভোগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে! কিন্তু জীবই সুখ-দুঃখ রূপ কর্ম্মফলের ভোক্তা, পরম নহেন, পরম সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র, ইহাই বেদোক্তি। অথচ "জীব ও পরম এক" বলিলে, পরমের সুখ-দুঃখ-ভোগ কিসে নিরাকৃত হয়? ফলকথা, জীব ও পরমে একত্ব কখন? না যখন সর্ব্বোপাধির অপগম। কর্ম্ম-ফল-ভোগ কতদিন? না জীবের অবিদ্যোপাধি যতদিন। এই বাসনা-বিকারে ভবরোগী কর্ম্মফলভোগী জীবের কর্ম্মভোগ সেই নির্গুণ নির্লেপ নিরুপাধিক ব্রহ্মে কিরূপে স্পৃষ্ট হইবে? ব্রহ্ম "শুদ্ধম-পাপবিদ্ধম্"। নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্ম পাপ-মলিন জীবের কর্ম্ম-কলঙ্ক

কিরূপে লাগিবে ? অনন্ত আকাশ ঘটাধারে সান্ত, তাই ঘটের অস্তিত্ব-কাল ব্যাপিয়া, নিত্যমুক্ত অনন্ত বহিরাকাশ হইতে সাময়িক ভাবে বদ্ধ সান্ত ঘটাকাশ অবশ্যই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য যতদিন, অবশ্য একত্বও অসিদ্ধ ততদিন। ঘটত্বের বিনাশেই একত্ব, সুতরাং সেই অনন্ত একে সান্ত ঘটের গুণ বা ঘট-ধর্ম্ম কিরূপে বর্ত্তিবে ? জীবের কর্ম্ম-ফলভোগ তাহার অবিদ্যাজনিত অজ্ঞতার ফল মাত্র ; কিন্তু পরমে অবিদ্যা বা অজ্ঞতা সম্ভবে না, যেহেতু নিরুপাধিকতায় তিনি উহার অতীত ; সুতরাং তাঁহার কর্ম্মফলভোগ স্বভাবতঃই সম্ভাবিত নহে।

অজ্ঞান-চক্ষু আকাশকে গাঢ় নীলবর্ণ দেখে, কিন্তু বিজ্ঞান-চক্ষু অবর্ণই দেখে। বর্ণের হেতু অন্য—বিষয় অন্য। বিজ্ঞানমতে উহা বৈদ্যুতিক ব্যাপারের বিকার-বিশেষ, ইত্যাদি। ফলে সূত্রের সার সিদ্ধান্ত এই যে, পারমার্থিক একত্ব সত্ত্বেও ঐহিক ভিন্নত্ব অনু-সারে জীবের ঐহিক কর্ম্মাদির ফলভোগ কখনও ব্রহ্ম-সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না ; যেহেতু উপাধিগত বিভিন্নত্ব বিস্পষ্ট বিদ্যমান। এই বিভিন্নত্বটি কি ? জ্ঞান ও অজ্ঞান—অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা এত-দুভয়ের পার্থক্য-সিদ্ধান্ত কিসে সিদ্ধ ? এতদুত্তরে বক্তব্য, পার্থক্যের অবস্থায় ফলভোগই অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্য, আর একত্ব-জ্ঞান বা বিদ্যার কার্য্যই ভোগাতীতত্ব বা মোক্ষ।

৯। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।

১০। প্রকরণাচ্চ।

১১। গুহাম্প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ।

१२ । विशेषणाच्च ।

१३ । अन्तर उपपत्तेः ।

१४ । स्थानादिव्यपदेशाच्च ।

१५ । सुखविशिष्टाभिधानादेव च ।

१६ । श्रुतोपनिषत्क-गत्यभिधानाच्च ।

१७ । अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ।

१८ । अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्म्मव्यपदेशात् ।

१९ । न च स्मार्त्तमतद्धर्म्माभिलापात् ।

२० । शारीरश्चोभयेऽपि भेदेनैनमधीयते ।

२१ । अदृश्यत्वादिगुणको धर्म्मोक्तेः ।

२२ । विशेषण-भेदव्यपदेशाभ्याञ्च नेतरौ ।

२३ । रूपोपन्यासाच्च ।

२४ । वैश्वानरः साधारणः शब्दविशेषात् ।

२५ । स्मर्य्यमानमनुमानं स्यादिति ।

२६ । शब्दादिभ्योऽन्तः-प्रतिष्ठानान्नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशा-
दसम्भवात् पुरुषमपि चैनमधीयते ।

२७ । अतएव न देवता भूतञ्च ।

२८ । साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ।

२९ । अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ।

३० । अनुस्मृतेर्ब्बादरिः ।

३१ । सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयति ।

३२ । आमनन्ति चैनमस्मिन् ।

৯ম ও ১০ম সূত্র দ্বারা একটী অধিকরণ রচিত, ১১শ ও ১২শ সূত্র দ্বারা অপর একটী অধিকরণ গঠিত, ১৩শ হইতে ১৭শ পর্য্যন্ত ৫টী সূত্র দ্বারা অন্য এক অধিকরণ ও ১৮শ হইতে ২০শ পর্য্যন্ত ৩ সূত্র দ্বারা আর একটী অধিকরণ গ্রথিত, ২১শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত ৩ সূত্র দ্বারা অন্য একটী অধিকরণ বিগঠিত, এবং ২৪শ হইতে ৩২শ সূত্র পর্য্যন্ত ৯টী সূত্র দ্বারা একটী অধিকরণ বিরচিত।

৯। "চরাচর" পদের প্রয়োগ হেতু 'অত্তা' (খাদক) শব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১০। প্রকরণ অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় অনুসারেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১১। "গুহা-প্রবিষ্টদ্বয়" বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে; কারণ এক তত্ত্ব-বস্তুর দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিলে, লৌকিক ব্যবহারে তাহার সমজাতীয় বস্তুই বুঝায়।

১২। বিশেষণ হেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৩। উপপত্তি-হেতু "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৪। অধিষ্ঠানাদির বর্ণনা থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৫। "সুখবিশিষ্ট" অভিধানহেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৬। বেদান্তবিদের পরমগতি-নির্দ্দেশ থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৭। "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা বুঝায় না; যেহেতু অন্য আত্মা [অন্যতাত্মক ভাবে] অনিত্য, এবং বর্ণিত অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের গুণ তাহাতে অপ্রযোজ্য।

১৮। গুণ-সমন্বয় হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৯। গুণ-বিরোধ-হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে সাংখ্যাদি-স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" প্রতিপাদ্য নহে।

২০। "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে "শরীরী" অর্থাৎ জীবাত্মা প্রতিপাদ্য নহে; কারণ আরণ্যকের উভয় শাখাতেই লক্ষণ-ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

২১। অদৃশ্যত্বাদি লক্ষণ বর্ণিত থাকায় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২২। বিশেষণ-ভেদ বর্ণিত হওয়ায়, পরমাত্মা ব্যতীত প্রধান বা জীবাত্মা অপ্রতিপাদ্য।

২৩। রূপের উপন্যাস থাকাহেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৪। বৈশ্বানর ও আত্মা, এই দুই পদানুগতরূপে দুয়ের লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, "বৈশ্বানর" পদে পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য।

২৫। অপিচ, স্মৃতির বর্ণনা, আমাদিগকে শ্রুতির অর্থ-বোধে সমর্থ করে।

২৬। যদি এই পূর্ব্বপক্ষ লওয়া যায় যে, বৈশ্বানর পদের অর্থ-পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় এবং জঠরাগ্নির লক্ষণ—পুরুষান্তর্ব্বর্ত্তিতার উল্লেখ থাকায়, উক্ত পদে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য নহেন; তবে সিদ্ধান্ত এই যে, স্বর্গলোক জঠরাগ্নির মস্তক হওয়া অসম্ভবহেতু এবং বাজ-সনেয়িগণ কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি-পক্ষে অপ্রযোজ্য "পুরুষ" পদের প্রয়োগ-হেতু উক্ত পদে পরব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৭। উপরোক্ত হেতুবাদে 'বৈশ্বানর'—অগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেবও নহে, ভৌতিক অগ্নিও নহে।

২৮। জৈমিনির মতে বৈশ্বানররূপে পরব্রহ্মের স্বরূপোপাসনার কল্পনাতেও কোনরূপ আপত্তি বা অনুপপত্তির হেতু নাই।

২৯। ঐশ্বরিক প্রকাশহেতু আশ্মরথ্যের মতেও তাহাই বটে।

৩০। অনুস্মরণহেতু বাদরির মতেও তাহাই।

৩১। কাল্পনিক নির্দ্দেশন-হেতু জৈমিনির মতেও পরব্রহ্মই "প্রাদেশ-মাত্র" বাক্যে বিজ্ঞেয়; বিশেষতঃ উহা শ্রুত্যুক্তি-সম্মত।

৩২। অপিচ, [জাবালমতেও] মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান-ব্যাপিত্ব-কল্পনাহেতু "প্রাদেশ-মাত্র" বাক্যে তত্ত্বতঃ পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয়।

৯ম ও ১০ম সূত্র।—নবম ও দশম সূত্র অনুসারে কঠোপনিষদুক্ত "অত্তা" (খাদক) পদে পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কঠোপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्चोभे भवत ओदनः
मृत्युर्यस्योपसेचनम् कइत्था वद यत्र सः।"

কেমনে কে জানে, কোন্ অধিষ্ঠানে
অধিষ্ঠিত তিনি হন।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র যাঁর উভয়ে আহার,
মরণ উপকরণ॥

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, এই উক্তি পরমাত্ম-প্রতিপাদিকা কি না? উত্তর, বিশ্বের তাবৎ পদার্থই যখন ব্রহ্মে প্রলয়-প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মকেই বিশ্বগ্রাসক বলা যায়। অতএব কঠবল্লী বলিতেছেন যে, তিনি সেই খাদক, এই বিশ্বচরাচর যাঁর খাদ্য। "ব্রহ্মক্ষত্র"

সমবেত সর্ব্বভূতেরই উদাহরণ-উপলক্ষ্য স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মই অত্তা বা খাদক। এখাণে অগ্নি খাদক হইতে পারেন না; কারণ অগ্নি "অন্ন-খাদক" পদে স্পষ্টই শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত। যথা—"অগ্নিরন্নাদঃ।" (বৃঃ উঃ ১।৪।৬) কিন্তু "সর্ব্বাদঃ" বা সর্ব্বখাদক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না। এস্থলে "মৃত্যুর্যস্যোপ-সেচনং" বাক্যেই ব্রহ্মের বিশ্বখাদকত্ব ব্যক্ত হইতেছে।

যদি এরূপ তর্ক ধরা যায় যে, নিরাকার পরমাত্মা নির্লেপ—নির্ভোগ, তাঁহার খাওয়া সম্ভবে না, এই তাৎপর্য্যই সচরাচর শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; পরন্তু জীবাত্মাই ভোগী বা খাদক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা—

"**তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি**" (মঃ ভঃ ২)
উত্তর এই যে, জীবাত্মার এই যে ভোজন, ইহা জগদ্-গ্রাসন নহে, ইহা কর্ম্ম-ফল-ভোজন মাত্র; কিন্তু পরমাত্মা নির্লেপ—সুতরাং নির্ভোগ, কারণ তিনি কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা নহেন, তিনি সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র। জীবাত্মাই কাম-কর্ম্মী ও ভোগ-ধর্ম্মী, অর্থাৎ যাচক ও খাদক। আর সমগ্র জগৎ-সমষ্টির খাদক বলিলে, ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে; কারণ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মেই বিশ্ব বিলীন হয়। অতএব সূত্রোক্ত "অত্তা" পদের ব্রহ্মবাচকত্ব অসঙ্গত বা অনুপপন্ন নহে।

কঠোপনিষদের আলোচ্য বিষয়ের ব্রহ্মই অবলম্বন। "**ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ** [কঃ উঃ ১।২।১৮] অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা যিনি, অজ ও অমর তিনি। এস্থলে যদি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য আত্মা বুঝিতে হয়, তবে আলোচ্য-বিষয়ের মূল-বিবৃতি-বিপর্য্যয়-জনিত

স্থূল অনুপপত্তি দোষ ঘটে ; কিন্তু তাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব, সুতরাং পরমাত্মা ব্রহ্মই অজ ও অক্ষর।

১১শ ও ১২শ সূত্র।—এই দুই সূত্রে কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য-সিদ্ধান্ত সমাহিত।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।"

[কঃ উঃ ১।৩।১]

দুয়ে ভবে সুকৃতের সুধারস পিয়ে।
সে পরমধামরূপ গুহাগত দুয়ে॥
সে দুয়েরে 'ছায়াতপ' বলে ব্রহ্মবিদ্‌জন।
ত্রিনাচিকেতাগ্নিযাজী—তথা পঞ্চাগ্নিকগণ॥

কোন্ দুয়ের বিষয় এস্থলে বলা হইয়াছে ? এ দুই কে কে ? অবশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মাই বটে ; কিন্তু ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় ? যেস্থলে মুণ্ডকোপনিষৎ স্পষ্টতঃ পরমাত্মা ব্রহ্মকে জীবাত্মার কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ অভোক্তা দ্রষ্টারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেস্থলে সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম এস্থলে আবার সুকৃত-কর্ম্মের সুফল-সম্ভোগী বলিয়া ব্যক্ত হইবেন কিরূপে ? উত্তর এই যে, যদিও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ কর্ম্মফলের অতীত, কিন্তু এস্থলে পরমাত্মবাচকত্ব ঔপমিকভাবেই ব্যবহৃত। এস্থলে বিশদরূপেই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, জীবাত্মাই নিশ্চয় কর্ম্মফল-ভোক্তা বটে, কিন্তু দ্বিবচনের প্রয়োগহেতু আমাদিগকে অবশ্য আর একটি আত্মার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুইটী মাত্র "আত্মা" নামক

আপাত-সমধর্ম্মী চৈতন্যস্বরূপ পদার্থসত্তা প্রসিদ্ধ থাকায়, ঐ অপরাত্মা পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে।

অপর, "গৌর্দ্বিতীয়োহন্বেষ্টব্যঃ।" এই গরুর দ্বিতীয়টি চাই, এ কথায় কিছু আমরা ঐ দ্বিতীয়টির পূরণার্থ গরু ব্যতীত কোন মনুষ্য বা ঘোটকের অনুসন্ধান করিব না; কারণ সাধারণতঃ এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, একাধিক বচনের পদ-প্রয়োগে সেই পদ-বোধিত পদার্থের একজাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, পরমাত্মাকে কিরূপে গুহা-প্রবিষ্ট—অর্থাৎ হৃদয়-প্রবিষ্ট বলা যাইতে পারে? ফলে উক্ত বাক্য রূপকভাবেই বিন্যস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদিও ব্রহ্ম বিশ্বময় বটেন, তথাপি সগুণাধিকারীর সসীম-জ্ঞান-জনিত বিশদ-বোধার্থে তাঁহার সসীম স্থিতি-স্থানবিশেষ কল্পিত হইতেছে। যেমন বিষ্ণু বিশ্ব-বিনিবিষ্ট হইয়াও, সগুণ-সাধন-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শালগ্রামশিলা-ধারে পূজিত হইয়া থাকেন। যাহাহউক্, জীব ও পরম, এই দুই আত্মাই ছায়া ও আতপরূপে কথিত হইয়াছেন। জীবাত্মা অজ্ঞানান্ধতমোরূপিণী অবিদ্যার অধীন, কিন্তু পরমাত্মা অবিদ্যার অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বজ্ঞান-জ্যোতিঃস্বরূপ; অতএব অবিদ্যাযুক্ত অজ্ঞ জীবাত্মা ছায়া এবং অবিদ্যামুক্ত সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা আতপ।

১২ সূত্রের সমাধেয় এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, এই দ্বিবিধ আত্মাই এ স্থলে অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে।

কঠোপনিষদে (১।৩।৩) উক্ত হইয়াছে,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥"

আত্মাকে জানিবে রথী, রথ জান দেহ।
বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগ্রহ॥

এইস্থলে 'আত্মা' পদে জীবাত্মাই বুঝাইতেছে। আবার আমরা উক্ত কঠবল্লীর ষষ্ঠ শ্লোক এইরূপ দেখিতে পাই,—

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্॥"

বিজ্ঞান-সারথি, আর মানস-প্রগ্রহ যার
পরিবদ্ধ রয়।
পার হ'য়ে ভ্রমপথ বিষ্ণুর পরম পদ
সেই প্রাপ্ত হয়॥

এস্থলে বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ পরমধাম সেই পরমাত্মতত্ত্ব। অতএব তৃতীয় বল্লীর তৃতীয় ও নবম শ্লোক দ্বারাই প্রথম শ্লোকের অর্থ বিশদীকৃত হইতেছে।

অতঃপর মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।১) দৃষ্ট হয়,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

প্রেমবদ্ধ পাখীদুটি সখা পরস্পর।
প্রেমভরে বাস করে এক বৃক্ষ'পর॥

সে দুটীর একটি মধুর ফল খায়।
অপরটী সাক্ষীরূপে চেয়ে দেখে তায়॥
এক বৃক্ষে করি বাস বঞ্চিতাত্মা পাখী।
শোকে ক্ষুণ্ণ আপনাকে শক্তিশূন্য দেখি॥
যবে সে পরাত্মা দেখে হ'য়ে যোগযুক্ত।
মহিমা বুঝিয়া হয় শোক-মোহ-মুক্ত॥

এখানে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি ও জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই। ফলে অনেকে এস্থলে বুদ্ধি ও জীবাত্মা ভাবিয়া ভুল করেন।

১৩শ হইতে ১৭শ সূত্র।—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১৫) দৃষ্ট হয়,—

"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত, এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম। তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি।"

সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম অভয় অমর।
যে পুরুষ অধিষ্ঠিত অক্ষি-অভ্যন্তর॥
সর্পি বা সলিল ইথে হ'লে সুসিঞ্চিত।
পথদ্বয় বাহি হয় বাহিরে নিঃসৃত॥

এস্থলে এই "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে অপরের অক্ষি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত কোন পুরুষবিশেষের প্রতিকৃতি প্রতিপাদিত হইবে না, পরন্তু পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইবেন। পরমাত্মা ব্রহ্মাই অভয় ও অমৃত। অতএব অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ অভয় ও অমৃত,

এ কথায়, উক্ত পুরুষ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারাই বিরোধের সমন্বয় ও সিদ্ধান্তের সদুপপত্তি হইবে। অক্ষিমণ্ডলে ব্রহ্মের অবস্থান রূপক-কল্পনা মাত্র। উহা দ্বারা ব্রহ্মের পরমাত্মধর্ম্মের পরম নৈর্ম্মল্যই আভাসিত হইতেছে। অক্ষিমণ্ডলে কিছুরই স্পর্শাঙ্ক প্রলিপ্ত থাকে না, উহা সতত সমুজ্জ্বল ও সুনির্ম্মল ; এই জন্যই রূপক ভাবে অক্ষিমণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান রূপে কল্পিত ও কথিত হইয়াছে।

কেবলমাত্র অক্ষিমণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান-স্থান রূপে উক্ত হয় নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৭) আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মের অধিষ্ঠান-স্থানরূপে পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি সমস্ত ভৌতিক মহৎ পদার্থই কল্পিত ও কথিত হইয়াছে। বহু নামরূপ-উপাধিই তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। এবম্বিধ উপাধির অবলম্বন ধ্যান-ধারণার অনুকূল উপায়।

১৫শ সূত্র। 'অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ' পদে যে ব্রহ্মকেই বুঝায়, তাহা 'ক' অর্থাৎ সুখ, এই শ্রৌতবাক্যবিশেষ দ্বারাও প্রতিপন্ন। সত্যকাম জাবাল নামক ঋষির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, উপকোশল নামক জনৈক ব্রহ্মবিদ্যার্থী দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল ব্রহ্মচারীরূপে উপস্থিত ছিলেন ; তথাপি তাঁহার উক্ত গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন না। অবশেষে গুরুদেবের আরাধিত আহিত অগ্নি স্বয়ং দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন—"প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম।" "প্রাণ" অর্থাৎ প্রাণবায়ু (শ্বাস) ব্রহ্মস্বরূপ, 'ক' অর্থাৎ সুখ ব্রহ্ম-স্বরূপ, 'খ' অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মস্বরূপ।

গার্হপত্য প্রভৃতি অগ্নিগণ তাঁহাকে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার গুরু তাঁহাকে এ বিষয়ে আরও শিক্ষা দিবেন। পরে গুরুও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের ব্রহ্মত্ব এবং তাঁহার অমরত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। উক্ত অগ্নিগণ 'ক' শব্দাত্মক শ্রুতি উল্লেখে যে ব্রহ্মতত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন এস্থলে গুরু সেই ব্রহ্মতত্ত্বই শিখাইলেন। অতএব "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে ব্রহ্মতত্ত্বই বোধিত।

'ক' (সুখ) শব্দে লৌকিক সুখকে বুঝায় না, পরন্তু ব্রহ্মানন্দই বুঝায়; 'খ' শব্দে ভৌতিক আকাশ বুঝায় না, কিন্তু উক্ত ব্রহ্মানন্দের আধারতত্ত্ব বুঝায়। এইরূপ আধার-আধেয়ত্ব ভাবেও স্বরূপতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই সূচিত। "যদ্বা কং তদেব খং যদেব খং তদেব কং।" যাহা ক, তাহাই খ, যাহা খ, তাহাই ক। এইরূপে 'খ' এর সমবায়িত্বায় 'ক'তত্ত্ব লৌকিক বা ঐন্দ্রিয়িক সুখবোধের অতীত আধ্যাত্মিক সুখ বা ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ হইয়াছে এবং 'ক'এর সমবায়িতায় 'খ'তত্ত্ব ভৌতিক ব্যোম বা আকাশের অতীত ব্রহ্মানন্দাধার স্বরূপ হইয়াছে। এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়িত্ব বা পরস্পরাপেক্ষত্ব-জনিত মৌলিক একত্ব "নীল-লোহিত ন্যায়" অনুসারে নিষ্পন্ন হয়। যেমন কোন বস্তুকে "নীল-লোহিত" বলিলে, তাহাকে 'নীল' বলা হয় না, 'লোহিত' ও বলা হয় না; ফলিতার্থে 'নীল-সাপেক্ষ লোহিত' বা 'লোহিতসাপেক্ষ নীল'ই বলা হয় ইহাও তদ্রূপ। তৎপর, "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি বাক্যের পর উক্ত হইয়াছে,—

"এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি। এষ উ ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষ লোকেষু ভাতি।"

সর্ব্ব পবিত্রতা তাঁতে থাকে।
'সংযদ্বাম' বলে তাই তাঁকে॥
সর্ব্বাশীষ তাঁহা হ'তে ফলে।
তাই তাঁকে 'বামনী'ও বলে।
সর্ব্ব লোক তাঁতে দীপ্তি পায়।
তাই বলে 'ভামনী'ও তাঁয়॥

এই বর্ণনা শুদ্ধ-মাত্র পরমাত্মাতেই প্রযোজ্য।

১৬শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে ব্রহ্ম, তাহা এইরূপেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে. যে ব্রহ্মকে জানে, সে মোক্ষ লাভ করে, এইরূপ শ্রুতি আছে এবং যে অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে জানে, সে মোক্ষলাভ করে, এরূপও শ্রুতি আছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যেখানে মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা নাই, সেখানে উক্ত উভয় মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা-স্থলে সেই একই ব্রহ্ম সূচিত হইতেছেন, বুঝিতে হইবে।

১৭শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ ছায়াত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, দেবাত্মা প্রভৃতি অন্য কোনবিধ আত্মা হইতে পারেন না। তাঁহারা 'আত্মা' পদবাচ্য হইলেও অনিত্য। 'অভয়' 'অমর' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিরুপাধিক নিত্য পরমাত্মা ব্যতীত উপরোক্ত অপরবিধ কোন সোপাধিক অনিত্য আত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। অপরের

অক্ষিদর্পণে কোন পুরুষবিশেষের প্রতিবিম্বরূপ ছায়াত্মা, বা ভয় ও মৃত্যুর আস্পদীভূত বিজ্ঞানাত্মা বা সূর্য্য প্রভৃতি জনন-মরণশীল দেবাত্মা, [যাঁহাদের তথাকথিত অমরত্ব সুদীর্ঘজীবিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে] ইঁহারা কেহই অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ হইতে পারেন না, কারণ উক্ত পুরুষের অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব বিস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, দেবতারাও ভয় অতিক্রম করিতে পারেন না।

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य्यः।
भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः।

এঁর ভয়ে ভয়ে, বায়ু সদা বহে,
এঁর ভয়ে সূর্য্য উঠে।
এঁর ভয়ে ভয়ে, বহ্নি বিশ্ব দহে,
চন্দ্র ফুটে—মৃত্যু ছুটে ॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণেই 'অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ' পরমাত্মা ব্রহ্মই হইতেছেন।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-(৩।৭) কথিত "অন্তর্যামী পুরুষ" সেই পরমাত্মাই বটে; সেই অন্তর্যামী পুরুষ ভূতলে, জলে, অনলে, পবনে, তপনে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, দেহে, মনে, সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তৎসমস্তকে নিয়মিত করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা কি

না? এতদুত্তরে বলা যায় যে. উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে ব্রহ্ম-লক্ষণই সূচিত হইতেছে। অন্তর্যামিত্বের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাদি ব্রহ্ম-লক্ষণেই সমন্বিত। অতএব ব্রহ্মই উক্ত অন্তর্যামি-পুরুষ।

বৃহদারণ্যক [৩।৭] উপসংহারভাগে এইরূপ বলিতেছেন, যথা—তিনি "অদৃষ্ট হইয়াও দর্শন করেন, অশ্রুত হইয়াও শ্রবণ করেন, অমনোগত হইয়াও মনন করেন এবং অজানিত হইয়াও জানেন। কেহ দেখে না, তিনি দেখেন। কেহ শুনেনা, তিনি শুনেন। কেহ মনন করে না, তিনি মনন করেন। কেহ জানিতে পারে না, তিনি জানেন। তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমর—অর্থাৎ নিত্য। তদিতর যাহা কিছু, সমস্তই মর্ত্ত্য অর্থাৎ অনিত্য।" এতাবতা ইহা বিশদীভূত হইল যে, 'অন্তর্যামী পুরুষ' পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন।

১৯শ সূত্র।—এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ সাংখ্যদর্শনোক্ত "প্রধান" হইতে পারে না কেন? প্রধানও অপ্রকাশ্য এবং অজ্ঞেয়। প্রধানও বিশ্বের কারণরূপে পরিগণিত; অতএব 'অন্তর্যামী পুরুষে'র লক্ষণে প্রধান কেন লক্ষিত হইবে না? এ তর্কের সমাধান এই যে, অন্তর্যামী পুরুষের এরূপ লক্ষণবিশেষও বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে তাহা কদাপি প্রধানে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যথা—প্রধান জ্ঞানশূন্য, সুতরাং দর্শন-শ্রবণ-মনন ইত্যাদি জ্ঞান-ক্রিয়া প্রধানে কদাচ সম্ভবে না, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মায়

সম্ভবে। অতএব অন্তর্যামী পুরুষের দর্শন শ্রবণাদি উল্লিখিত হওয়ায়, উহাতে পরমাত্মাই সূচিত হইতেছেন।

২০শ সূত্র—অতঃপর এইরূপ তর্ক উত্থিত হইতে পারে যে, জীবাত্মা দেহান্তর্ব্বর্ত্তী রহিয়া দৈহিক ক্রিয়াদি নিয়মন ও পরিচালন করিতেছেন। তিনি চেতনস্বরূপ ও অদৃষ্ট; কারণ ক্রিয়া-নিষ্পাদনের সহিত যুগপৎ কর্ত্তার কর্ম্মত্ব-প্রাপ্তি অসম্ভব। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেৎ।" দৃষ্টের দ্রষ্টা স্বয়ং দ্রষ্টব্য নহেন; অতএব জীবাত্মাই 'অন্তর্যামী পুরুষ' হইতে পারেন। উত্তর এই যে, যদিও জীবাত্মা উপাধিদ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং যদিও দেহান্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া দেহকে নিয়মিত করেন, কিন্তু ইনি বৃহদারণ্যক-বর্ণিত অন্তর্যামী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করেন না। অতএব ইনি কিরূপে সেই 'অন্তর্যামী পুরুষ' হইবেন? দ্বিতীয়তঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয় শাখাই স্ব স্ব সিদ্ধান্তে জীবাত্মা ও অন্তর্যামী পুরুষের স্পষ্ট পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। কাণ্ব (বৃঃ আঃ উঃ ৩৭ ২২) বলেন যে, "যিনি স্বয়ং জ্ঞানাধিষ্ঠিত, জ্ঞান যাঁহাকে জানে না, জ্ঞানই যাঁহার দেহস্বরূপ, যিনি অন্তর্দ্দেশ হইতে জ্ঞানকে নিয়মিত বা পরিচালিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী আত্মা।" ইহাই কাণ্বোক্ত সিদ্ধান্ত। আর যদি আমরা এস্থলে জীবাত্মাকেই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানাত্মার স্থানীয় ধরি, তবেই আমরা মাধ্যন্দিনোক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই। কাণ্বোক্ত বিজ্ঞানতত্ত্ব মাধ্যন্দিনোক্ত জীবাত্মতত্ত্ব দ্বারাই অববোধিত। এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এইরূপে পার্থক্য পরিসূচিত হইতেছে।

তৎপরে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, 'অন্তর্যামি-পুরুষ' দুইটি কিনা ? অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা নিয়ামক জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, এই দুইটি কিনা ? কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্বতঃ একত্ব শ্রুতিসম্মত। এস্থলে উত্তর এই যে, আত্মা মোটে একটি মাত্র। উপাধির অবচ্ছেদ-বশে বহুবৎ প্রতীয়মান। যথা —ঘটাকাশ, ঘটোপাধি-অবচ্ছিন্ন মহাকাশ। মায়িক জগতে এক জীবাত্মা অপর জীবাত্মা হইতে এবং পরমাত্মা হইতে প্রভিন্ন, কিন্তু সাধনবলে যাঁহার অন্তশ্চক্ষুর নিকট হইতে অবিদ্যাবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার সম্মুখে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পরমাত্মা মাত্র প্রকাশিত। তখন দ্রষ্টা-দৃশ্য—জ্ঞাতা-জ্ঞেয় একত্বে পরিণত। শ্রুতি বলেন, "যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" অর্থাৎ—

দ্বৈতজ্ঞান যেখানে,
দেখাদেখি সেখানে।
অদ্বৈতাত্মজ্ঞান যথা,
কেবা কারে দেখে তথা ?

২১শ সূত্র।—মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहस्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैवा-पराच। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्व्वेदः सामवेदोऽथर्व्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तः छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं

তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূত-যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।"

পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা হন।
এ দুয়ে জানিতে হবে, ব্রহ্মজ্ঞেরা কন ॥
ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্ব চারি বেদগ্রন্থ।
শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত ও ছন্দ ॥
জ্যোতিষ সহিত এই বেদ-অঙ্গ ছয়।
এ শিক্ষা অপরা-বিদ্যা-বলে সিদ্ধা হয় ॥
পরাবিদ্যা-বলেতে অক্ষর হন জ্ঞাত।
অদৃশ্য অগ্রাহ্য যিনি অবর্ণ অজাত ॥
অচক্ষু অশ্রোত্র যিনি অপাণি অপদ।
নিত্য বিভু সুসূক্ষ্ম অব্যয় সর্ব্বগত ॥
যাঁহা হ'তে সর্ব্বভূত সমুদ্ভূত ভবে।
পরাবিদ্যা-বলে জ্ঞানী তাঁর জ্ঞান লভে ॥

বক্ষ্যমাণ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, পূর্ব্ববর্ণিত সর্ব্বভূত-সমুৎপাদয়িতা অদৃশ্য অগ্রাহ্য ইত্যাদি বিশেষণ-বেদ্য যিনি, তিনি পরমাত্মা না জীবাত্মা? সিদ্ধান্ত এই যে, "সর্ব্বভূত-সমুৎপাদক" বলিলেই পরমাত্মা বুঝায়; অন্যান্য বর্ণিত বিশেষণের বিচার বাহুল্য মাত্র। যে সমস্ত গুণ বা লক্ষণ এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা ব্যতীত দেহোপাধি-অবচ্ছিন্ন অবিদ্যাধীন জীবাত্মা বা মাত্র-জড়-তত্ত্বস্বরূপ অচেতন প্রধানে কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এস্থলে আরও একটি তর্ক উঠিতে পারে যে, প্রধানও অদৃশ্য

এবং ইহা হইতেই সর্ব্বভূত উদ্ভূত, বলা যাইতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, মুণ্ডকোপনিষদে যে পুরুষের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, শুধু অদৃশ্যত্ব মাত্র তাঁহার গুণ বা লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞত্ব—সর্ব্বান্তর্যামিত্ব প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপগত বিশিষ্ট লক্ষণাবলীও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি। [মুঃ উঃ ১।১।৯] পরমাত্মা ব্যতীত উক্ত বিশেষণগুলি স্বভাবানুসারে কদাচ প্রধান বা জীবাত্মার যোগ্য নয়। তারপর "**কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।**" [মুঃ উঃ ১।১৩] অর্থাৎ—

হে আর্য্য! জানিলে কারে,
সমস্ত জানিতে পারে?

এই শ্রুত্যুক্তিদ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হইতেছে যে, সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মাই সর্ব্বথা সুপ্রতিপন্ন।

২২শ সূত্র। 'সর্ব্বভূতযোনি' যে পরমাত্মা ব্রহ্মাই বটেন, তাহা এই দ্বাবিংশ সূত্রে একটি অতিরিক্ত সুযুক্তি সহযোগে সমর্থিত হইয়াছে। এক পক্ষে পরমাত্মার ব্রহ্ম-লক্ষণাবলী ও অপরপক্ষে প্রধানের তত্ত্ব-লক্ষণাবলী পরস্পর স্বতন্ত্র ও সুবিশদ। মুণ্ডকোপনিষৎ (২।১।২) বিস্পষ্ট বলিতেছেন,—

"**দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হি অজোঽপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ।**"

সে দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ যিনি,
বাহ্য-অভ্যন্তর অজ ও অমর,
অপ্রাণ অমন অমল তিনি।

এ বর্ণনার বিষয়ীভূত বা অধিকারাস্পদ হওয়া প্রধান বা জীবাত্ম-পুরুষের যোগ্যতাবহির্ভূত।

অতঃপর সেই সর্ব্বভূতজনয়িতার এরূপও লক্ষণ লক্ষ্য করা হইয়াছে যে—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সৃষ্টি অনিত্য হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য বিধায়, এই সৃষ্ট বিশ্বের ভৌতিক সুসূক্ষ্ম কারণতত্ত্ব প্রধানকে এস্থলে 'অক্ষর' বলা হইয়াছে। এই প্রধান স্বয়ং পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই আশ্রিত থাকিয়া, বিবিধ জাগতিক নাম-রূপ বা পরমাত্মার বিবিধ উপাধি কল্পনা করে। তর্কস্থলে যদি প্রধানকে স্বায়ত্ত্ব বা স্বাধীনসত্ত্বও কল্পনা করা যায়, তথাপি "শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" এ কথায় স্পষ্টই প্রধান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থান্তর সূচিত হইতেছে, সন্দেহ নাই; অতএব সেই পদার্থান্তর প্রধান হইতেও প্রধান—পরাৎপর পরমাত্মা ব্রহ্ম।

২৩শ সূত্র। এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, যেরূপ রূপোপন্যাস উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রধান কখনই সর্ব্বভূত-জনয়িতারূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন্ না।

অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

অগ্নি মূর্দ্ধা, রবীন্দু নয়ন।
দিক্ শ্রুতি, বেদোক্তি বচন॥
বায়ু যাঁর নিশ্বাস-নিস্বন।
হৃদি যাঁর এ বিশ্বভুবন॥

চরণে ধরণীধর যিনি।
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা তিনি॥

এইরূপ বর্ণনা ব্রহ্মেরই সম্ভবে, কিন্তু প্রধানের বা জীবাত্মার নহে; কারণ অজ্ঞ প্রধান কখনও সর্ব্বভূতান্তরাত্মা হইতে পারেন না।

পরমাত্মা ব্রহ্মের রূপ-প্রদর্শন জন্যই যে এরূপ রূপ-বর্ণনা হইয়াছে, তাহা নহে; উহা রূপকোক্তি মাত্র। উহাদ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বভূতান্তরাত্মতাই সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদোক্ত হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপেও পরমাত্মা সূচিত হন নাই।

"हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे,
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां,
कस्मै देवाय हविषा विधेम॥"

সমুদিত সর্ব্বাগ্রে—হিরণ্যগর্ভ যিনি।
একমাত্র জাত ভূতপতি হন তিনি॥
স্থাপিলেন তিনি এই আকাশ-পৃথিবী।
কোন্ দেবোদ্দেশে মোরা নিবেদিব হবি॥

এই হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা নহেন; কিন্তু পরমাত্মা হইতে সম্ভূত দেবপুরুষ বা ঈশ্বরবিশেষ। ইনি ব্রহ্মের সগুণ-স্বরূপাত্মক প্রথমাবতার স্বরূপ। শ্রুত্যন্তরে ইঁহাকে 'ব্রহ্মা' বলা হইয়াছে। ঔপনিষদী উক্তি অনুসারে ইঁহাকে "সর্ব্বভূতাত্মা" বলিলেও অনুপপত্তি হয় না; কিন্তু তিনি সর্ব্বভূত-সৃষ্টির আদিকারণ নহেন।

২৪শ সূত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদের (৫।২) একটী উক্তিতে আত্মা "বৈশ্বানর" পদে উক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বিষয় এই যে, এই 'বৈশ্বানর' পদে জঠরাগ্নি, বাহ্য ভূতাগ্নি বা অগ্ন্যধিষ্ঠাতা দেব-পুরুষবিশেষ ইত্যাদিই বুঝাইবে, না পরমাত্মা বুঝাইবে? অপিচ, উক্ত পদ আত্মার সাধারণ-লক্ষণ-বিশেষত্বে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহাদ্বারা "জীবাত্মা" বুঝাইবে কিনা, তাহাও আলোচ্য।

উত্তর এই যে, উহাদ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হইতেছেন। অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্ম, সুতরাং এতদ্দ্বারা তদিতর পদার্থান্তর সূচিত হওয়া সম্ভবে না। অতএব এস্থলে "বৈশ্বানর" পদে জঠরাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিতত্ত্ব সূচিত হইলেও, অন্যান্য লক্ষণানুসারে আত্মতত্ত্বও সূচিত হয়; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, উক্ত আত্মতত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্বই বটে, জীবাত্মতত্ত্ব নহে। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्व्वेषु लोकेषु सर्व्वेषु भूतेषु सर्व्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति, तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्द्धैव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लोमानि बर्हिर्हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्य्यपचन आस्यमाहवनीय इत्यादि।"

প্রাদেশমাত্রাভিমানী বৈশ্বানর-ধ্যাতা যেই।
সর্ব্বলোক-সর্ব্বভূত-সর্ব্বাত্মসম্ভোগী সেই॥

এই বৈশ্বানরাত্মার মস্তক সুতেজোময়।
রশ্মিরূপ নেত্র তাঁর—শ্বাস পৃথগ্বর্ত্ম হয়॥
সন্দেহ বহুল তাঁর—বস্তি রয়ীরূপ।
চরণ-ধরণী—বক্ষ বেদিকা-স্বরূপ॥
লোমাবলী বেদিকার তৃণরূপী হয়।
গার্হপত্য অগ্নিরূপী তাঁহার হৃদয়॥
অন্বাহার্য্য অগ্নিরূপী হয় তাঁর মন।
যে অগ্নি আহবনীয়, সে তাঁর আনন॥

উপরোক্ত বর্ণনায় ব্রহ্মতত্ত্বই বিস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত। প্রাচীন আর্য্যজাতি ব্রহ্ম-মূর্ত্তি-স্বরূপেই অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাত্ম-বোধক ভাবেই 'অগ্নি' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা কদাপি একের স্থলে অন্যের সূচনা দ্বারা প্রমাদ-পতিত হন নাই।

২৫শ সূত্র।—স্মৃতিও পরমাত্মার বর্ণনা করিতেছেন। উহা উপরোক্ত বৈশ্বানরাত্ম-বর্ণন-প্রণালীতেই বর্ণিত। স্মৃতিদ্বারাই শ্রুতির অর্থ আমাদের অধিগত হয়।

স্মৃতির পরমাত্মবর্ণন এইরূপ,—

"দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিঞ্চ,
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূত-প্রণেতা।।১১

বলেন ব্রাহ্মণবর্গ, মস্তক যাঁহার স্বর্গ,
অন্তরীক্ষ নাভি যাঁর, রবীন্দু নয়ন;

দিক্ যাঁর শ্রোত্ররূপ, পৃথিবী পদস্বরূপ,
তিনি হন সর্ব্বভূত-অনাদিকারণ।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বৈশ্বানর-শব্দেও সর্ব্বভূত-কারণই সূচিত হন।

২৬শ সূত্র।—এইরূপ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, 'বৈশ্বানর' শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও কি কারণে উহা অন্যার্থে প্রযুক্ত হইবে? অন্তরস্থ বৈশ্বানর বলিলে, উহাতে বৈশ্বানরের স্বভাববিশেষ প্রতিপাদিত হওয়ায় উহা দ্বারা জঠরাগ্নিই প্রতিপন্ন হয়, এবং এই হেতুই উহা পরমাত্ম প্রতিপাদক হইতে পারে না। উত্তর এই যে, পরমাত্মতত্ত্ব এইরূপেই বোধবিষয়ীভূত হন। সসীম-উপাধ্যবচ্ছিন্নত্ব ব্যতীত অসীম পরমাত্মার বোধবিষয়ত্ব সম্ভবে না; এই হেতুই এ স্থলে বৈশ্বানরত্ব তাঁহার উপাধিস্বরূপ।

চতুর্ব্বিংশ সূত্র প্রকরণে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দারা বাহ্য জড়াগ্নি বা জঠরাগ্নি প্রভৃতি বুঝিতে হইলে, উহা ফলিতার্থে অর্থশূন্যই হইয়া পড়ে। যদি তদ্দারা মাত্র জঠরাগ্নিই বুঝাইত, তবে "পুরুষান্তর্ব্বর্ত্তী অগ্নি" বাক্যেই তাহা সিদ্ধ হইত; কিন্তু বাজসনেয়িগণ কর্ত্তৃক তাহা "পুরুষ" পদেও অভিহিত হইয়াছে; অতএব উক্ত বর্ণনায় অগ্নি বা জঠরাগ্নি বুঝাইবে কিরূপে? বাজসনেয়িগণ তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—

"স যো হৈতমেব অগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ।"

যেই জন জানে এই অগ্নি বৈশ্বানরে।
পুরুষ-স্বরূপে আর পুরুষ-অন্তরে ॥

২৭শ সূত্র।—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রসমূহের আলোচিত হেতুবাদ-বশে "বৈশ্বানর" মাত্র ভৌতিকাগ্নি বা অগ্ন্যধিষ্ঠাতা কোন দেবপুরুষ-বিশেষ হইতে পারেন না।

২৮শ সূত্র।—ষড়্‌বিংশ সূত্রের আলোচনায় **"পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং"** এই বাক্যে জঠরাগ্নি অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু উহা-দ্বারা অন্তঃসাক্ষি-স্বরূপে পরমাত্মাও বুঝা যাইতে পারে। যেহেতু পরমাত্মা প্রতিপুরুষান্তরে অফলভোগী থাকিয়া, সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষী-স্বরূপে সংস্থিত, এইরূপ শ্রুত্যুক্তি আছে। অতএব মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে, জঠরাগ্নিকে উপাধিস্বরূপ মধ্যবর্ত্তীরূপে কল্পনা না করিয়া, উক্ত ঔপনিষদী উক্তি দ্বারা স্বয়ং সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বদ্রষ্টা পরমাত্মাই প্রতিপাদিত এইরূপ সহজ উপপত্তিই গৃহীত হইতে পারে। এই শ্রুত্যুক্তি যেস্থলে বৈশ্বানরকে পুরুষান্তর্ব্বর্ত্তী—অথচ স্বয়ং পুরুষ-স্বরূপ বলিয়াছেন, সেস্থলে তদ্দারা পরমাত্মাই পরিস্ফুটরূপে প্রতি-পাদিত হইতেছেন, সন্দেহ নাই। "বৈশ্বানর" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, যথা—

"বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি, বিশ্বেষাং বা অয়ং নরঃ, বিশ্বে বা নরা অস্যেতি বিশ্বানরঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মত্বাৎ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ তদ্ধিতো নান্যার্থঃ।"

যিনি বিশ্বরূপ যিনি নররূপ,
বিশ্ব-নররূপ যিনি,

বিশ্ব-জীব আত্মা, নরাত্মা পরাত্মা
"বৈশ্বানর" বটে তিনি।
বিশ্বানর-পদ, বৈশ্বানর-পদ,
সমার্থসূচক হয়।
তদ্ধিত-প্রত্যয় প্রয়োগে নিশ্চয়
ভিন্নার্থবাচক নয়।

২৯শ হইতে ৩২শ সূত্র।—আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন, যদিও পরমাত্মা সর্ব্বমিতি-মাত্রাতীত, তথাপি তাঁহার ধ্যানাধিগম্যতা-মুলক প্রকাশ কল্পনায় তাঁহাকে "প্রাদেশ-মাত্র" বলা হইয়াছে। সাধকগণের হিতার্থে পরব্রহ্ম হৃদয়, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি স্থানে ধ্যানাধিগম্য-ভাবে প্রকাশিত। বাদরি বলেন,—পরমাত্মাকে "প্রাদেশ-মাত্র" বলার হেতু এই যে, তিনি অনন্তমাত্রায় বা মাত্রাতীত সত্তায় "**অবাঙ্‌মনসো-গোচরম্**" কিন্তু মনের উপাস্য হইতে হইলে, তাঁহাকে সান্তমাত্র ও মনের ধ্যানাধিগম্য বা স্মর্ত্তব্য স্বরূপে প্রকাশিত হইতে হইবে। এইজন্যই তিনি শাস্ত্র-কথিত হৃদয়স্থ প্রাদেশমাত্রাত্মক—অর্থাৎ মনের আয়ত্তিযোগ্যভাবে স্বয়ংই "প্রাদেশমাত্র" রূপে কল্পিত হইয়াছেন। অথবা সরলভাবে এরূপও বুঝা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে "প্রাদেশমাত্র" না হইলেও, "প্রাদেশমাত্র"-রূপেই তিনি যোগীহৃদয়ের যোগ-ধ্যানাধিগম্য হইয়া থাকেন।

আচার্য্য জৈমিনিও বলেন, "প্রাদেশমাত্র" বিশেষণ ব্রহ্মের কাল্পনিক নির্দ্দেশ মাত্র। বাজসনেয়ীব্রাহ্মণ আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদিকে বৈশ্বানরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়াছেন। শিরোর্দ্ধ দেশ

হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান প্রাদেশপরিমিত ; ইহার মধ্যস্থলে ভ্রূমধ্যে "আজ্ঞাচক্রে—দ্বিদলে" যোগীর ধ্যানায়ত্ত ঐশতত্ত্ব অবস্থিত। অতএব ত্রিভুবনাত্মা ভগবান্ প্রাদেশমাত্রাত্মকরূপে ঐ স্থানে বদামা ন। "বৈশ্বানর" পুরুষের তথাবিধ প্রাদেশমাত্রাত্মক বিদ্যমানতা বর্ণিত হওয়াতে, তদ্দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই প্রতিপাদন হইতেছে। জাবাল তাঁহাকে মূৰ্দ্ধা ও চিবুক দেশের ব্যবধান-মধ্যবৰ্ত্তী বলেন। ফলে নাসিকাগ্র অর্থাৎ ভ্রূমধ্যই পরমাত্মার যোগ-ধ্যানাধিগম্য স্বরূপের অধিষ্ঠান-স্থান।

তৃতীয় পাদ।

১। द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्।

২। मुक्तोपसृप्यं व्यपदेशात्।

৩। नानुमानमतच्छब्दात्।

৪। प्राणभृच्च।

৫। भेदव्यपदेशात्।

৬। प्रकरणात्।

৭। स्थित्यदनाभ्याञ्च।

৮। भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्।

৯। धर्म्मोपपत्तेश्च।

১০। अक्षरमम्बरान्तधृतेः।

১১। सा च प्रशासनात्।

১২। अन्यभाव-व्यावृत्तेश्च।

१३। ईक्षतिकर्म्मव्यपदेशात्।

१४। दहर उत्तरेभ्यः।

१५। गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिङ्गञ्च।

१६। धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः।

१७। प्रसिद्धेश्च।

१८। इतर परामर्शात् स इति चेन्नासम्भवात्।

१९। उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु।

२०। अन्यार्थश्च परामर्शः।

२१। अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्।

२२। अनुकृतेस्तस्य च।

२३। अपि च स्मर्य्यते।

১ম হইতে ৭ম সূত্র পর্য্যন্ত এক অধিকরণ। ৮ম ও ৯ম সূত্র আর এক অধিকরণ, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সূত্র অন্য এক অধিকরণ, ১৩শ সূত্র এক অধিকরণ, ১৪শ হইতে ১৮শ পর্য্যন্ত অপর এক অধিকরণ, ১৯শ, ২০শ ও ২১শ সূত্র এক অধিকরণ এবং ২২শ ও ২৩শ সূত্র স্বতন্ত্র এক অধিকরণ।

১। 'স্ব' শব্দের প্রয়োগ-হেতু স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠান উক্ত হওয়ায়, তদ্দারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

২। মুক্ত পুরুষেরাই সে স্থান প্রাপ্ত হন, ইহার উল্লেখ থাকাতে, ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৩। স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতি অধিষ্ঠান দ্বারা সাংখ্য-প্রতিপাদিত প্রধান সূচিত হন না; কারণ ঐ সমুদায় শব্দ দ্বারা প্রধানকে বুঝায় না।

৪। স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতি অধিষ্ঠান-উল্লেখ দ্বারা জীবাত্মাকেও বুঝায় না।

৫। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য পরিব্যক্ত থাকাতেও জীবাত্মাকে বুঝায় না।

৬। প্রকরণের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম হওয়াতেও জীবাত্মা বুঝায় না;

৭। ভোক্তৃত্ব ও সাক্ষিত্ব, এই দুই বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ থাকাতেও জীবাত্মা বুঝায় না।

৮। সম্প্রসাদ বা সুষুপ্তির অতিরিক্ত তত্ত্ব-নির্দ্দেশ হওয়ায় "ভূমা" শব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৯। ব্রহ্মের ধর্ম্ম ও ভূমার ধর্ম্ম অভিন্নরূপে উপপন্ন হওয়ায় "ভূমা" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১০। "অক্ষর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; যেহেতু উহা আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতেরই আধার।

১১। অক্ষরের প্রশাসনই এই আধারের হেতু।

১২। শাস্ত্রে অক্ষরকে অন্যান্য অনিত্য পদার্থ হইতে প্রভিন্ন করাতেও "অক্ষর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৩। ঈক্ষণের বিষয় হওয়াতেও "অক্ষর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৪। পরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে "দহর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৫। "ব্রহ্মে গতি" এবং "ব্রহ্মলোক" পদের শ্রৌত উল্লেখ থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; ইহাই একটী "লিঙ্গ" অর্থাৎ চিহ্ন।

১৬। "ধৃতি" হেতুও "দহর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত, কারণ বিশ্বধৃতির মহিমা ব্রহ্মেই উপলব্ধ হয়।

১৭। দহরের এইরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ থাকাতেও তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৮। জীবাত্মার উল্লেখ থাকাতেও অসম্ভবত্ব হেতু 'দহর' পদে জীবাত্মা বুঝায় না।

১৯। পরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২০। "জীবাত্মা" পদের অভিপ্রেত অর্থ স্বতন্ত্র।

২১। অল্প বা সূক্ষ্মাকাশ পদে বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধ-জনিত অনুপপত্তি-আশঙ্কার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

২২। ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপতার অনুকৃতি হইতেও ব্রহ্মতত্ত্বই প্রতিপাদিত।

২৩। ঔপনিষদী স্মৃতিতেও বিশ্বজ্যোতিভাবে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১ম সূত্র।—মুণ্ডকোপনিষৎ (১১—২। ৫) বলেন,—

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।" অর্থাৎ——

স্বর্গ, পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ আর।
অনুস্যূত সত্তায় যাঁহার॥
মনঃপ্রাণ সমস্তই যিনি।
জান'তাঁরে, পরমাত্মা তিনি॥

অপর প্রসঙ্গ পরিহারে।
অমৃতের সেতু জান তাঁরে॥

ব্রহ্মই এস্থলে অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত পরিষ্কৃত। "**তমেবৈকং জানথ আত্মানম্**" এই বাক্যের প্রয়োগেই উহা স্পষ্টীকৃত।

"সেতু" শব্দের প্রয়োগে পদার্থান্তরের অপেক্ষা সুস্পষ্ট সূচিত হইতেছে। যাহা এক কূল হইতে অপর কূল সহ সংযোজিত হয়, তাহাই সেতু। অতএব "সেতু" এক কূল হইতে অপর কূল রূপ পদার্থান্তর-প্রাপ্তির অপেক্ষা সূচনা করে; কিন্তু ব্রহ্ম "**অনন্তমপারম্**"; তিনি আবার কোন্ সান্ত সপারের দুইপার-সংযোজক হইবেন? ফলে "সি" ধাতু-নিষ্পন্ন "সেতু" পদের প্রকৃত অর্থ সংযোজন বা একত্রীকরণ বটে, কিন্তু পার-দ্বয়-সংযোজন-সেতুত্ব অবশ্য এখানে অভিপ্রেত নয়; কেবল সংযোজন বা মিলনই এখানে অভিপ্রেত। অতএব যাঁহাতে জীবের অমৃতত্ব-সম্মিলন সংসিদ্ধ হয়, তিনিই অমৃতের সেতু। "**বিধরণ্যালমানমত সেতুস্তুস্যো বিবন্ধ্যতে ন পারবত্তাদি।**"

সমস্তই ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, যেমন লবণ-সমষ্টির অন্তর্বাহ্য-ভেদ-বিশেষত্ব নাই; উহা মোটের উপর আস্বাদবিশেষের সমষ্টি মাত্র; তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বেরও জ্ঞেয়ত্বের অন্তর্বাহ্য-ভেদ-ভাব নাই; উহা মোটের উপর জ্ঞান-সমষ্টি স্বরূপ। যথা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৭—৫।১৩। বলিতেছেন—

"**স যথা সৈন্ধব-ঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্ন-প্রজ্ঞানঘন এব।**"

সৈন্ধব-সমষ্টিসার, নাহি তাহে যে প্রকার,
অন্তর্বাহ্য-ভেদ-বিশেষত্ব ;
আস্বাদ-সমষ্টিসার ; ব্রহ্মতত্ত্ব সে প্রকার,
প্রজ্ঞান-সমষ্টি মাত্র সত্য।

সমস্তই ব্রহ্ম,—অর্থাৎ "ব্রহ্মই সর্ব্বপদার্থ" বলিলে, ব্রহ্মের বহুরূপত্ব বুঝায় না ; পরন্তু প্রকৃতি-রূপত্ব বুঝায়। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতিতত্ত্ব ব্রহ্মেরই রূপ।

২য় সূত্র।—স্বর্গ-পৃথিবী ইত্যাদির আধার বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায়। স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির সর্ব্ববন্ধ-স্খলিত মুক্ত পুরুষও ব্রহ্মতত্ত্বেই যুক্ত ; অতএব মুক্তের মিলনাধিকরণ ব্রহ্মতত্ত্বগত।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

হৃদয়ের হয় গ্রন্থিভেদ।
হয় সর্ব্বসংশয়ের ছেদ॥
সমস্ত কর্ম্মের হয় ক্ষয়।
পরাবর-দর্শনে নিশ্চয়।

এস্থলে "পরাবর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। অপিচ,

"যথাবিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

নামরূপ-বিমুক্ত বিজ্ঞানবান্ জন।
প্রাপ্ত হন পরাৎপর পুরুষ পরম॥

এই সমস্ত উক্তিগুলিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মই মুক্ত পুরুষের আশ্রয় ; কিন্তু প্রধান বা অন্য কোন তত্ত্ব নহে।

৩য় সূত্র—স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতির আধারতত্ত্ব ব্রহ্ম ভিন্ন সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি কখনও হইতে পারে না; কারণ উক্ত সূত্রোক্ত শব্দেই তাহা সূচিত হইবার নহে। পরমপূত শাস্ত্রসমূহের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, চিৎসত্ত্বই বিশ্ব-কারণ; সুতরাং অচিৎসত্ত্ব প্রধান তাহা কিরূপে হইবে? এই চিৎসত্ত্বই ব্রহ্ম।

৪র্থ সূত্র—জীবাত্মাও সেই কারণবশেই স্বর্গ-পৃথিব্যাদির আধার-তত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। পবিত্র শাস্ত্র সকল ব্রহ্মকেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বস্থ বলেন, কিন্তু জীবাত্মাকে (চিৎসত্তা প্রভৃতি ব্রহ্ম-সমধর্ম্মিতা পাইলেও) তাহা বলা হয় নাই।

৫ম ও ৬ষ্ঠ সূত্র।—অপিচ শাস্ত্র বলেন, একমাত্র তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞাত হও। এই স্থলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতায় পার্থক্য সূচিত হইতেছে। আত্মাকেই এস্থলে 'জ্ঞেয়' এবং জীবকে "জ্ঞাতা" বলা হইয়াছে। আত্মাই স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির আধার, কিন্তু জীব কদাচ নহে। বিশেষতঃ আলোচ্য অধ্যায়টির বিষয়ই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। মুণ্ডকোপনিষদে ১।১।৩) দৃষ্ট হয়,

"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি—অর্থাৎ—

"হে আর্য্য! জানিলে কারে,

সমস্ত জানিতে পারে?"

যদি এই উক্তিটি দ্বারা জীবাত্মাকেই বুঝায়, তাহা হইলে আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয়-বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। তাহা হইলে যাহা হয়, তাহা অদ্ভুত ও অসঙ্গত।

৭ম সূত্র।—ব্রহ্মসূত্রের ২য় পাদের প্রথম অধ্যায়ের ১১শ

সূত্রের আলোচনায় যাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিচারিত হইয়াছে, সেই মুণ্ডকোপনিষদের (৩। ১। ১) উক্তির মর্ম্ম এইরূপ,—

"প্রেমেবদ্ধ পাখীদুটি সখা পরস্পর।
প্রেমভরে বাস করে একবৃক্ষ-পর॥
সে দুয়ের একটি মধুর ফল খায়।
অপরটি সাক্ষীরূপে চেয়ে দেখে তায়॥"

এই পাখীদুইটির মধ্যে ভোক্তাটি জীব ও দ্রষ্টাটি ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আলোচ্য বিষয়ের মূলতত্ত্ব; তবে জীবাত্মার উল্লেখ কেবল অবান্তরভাবে কৃত। অতএব স্বর্গ-পৃথিব্যাদির আধারতত্ত্ব ব্রহ্ম। যদি তর্কচ্ছলে বলা যায় যে, ব্রহ্মের উল্লেখই অবান্তরভাবে কৃত হইয়াছে, তবে তাহা অসঙ্গত হয়; যেহেতু অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব বিধায় উহার সমাধান আনুষঙ্গিক বা অবান্তর আলোচনায় কুলায়না; পরন্তু অধিকতর বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনারই প্রয়োজন। জীবাত্মার অনুভূতি সকলেরই আত্মানুভূতিতে স্বতঃ-সাধারণ-পরিচিত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক বিধায়, উহার অবান্তর উল্লেখ আপত্তিজনক হয় নাই।

৮ম সূত্র।—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত (৭-২০, ২৪) "ভূমা" শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য কি না, তদালোচনাই এই সূত্রের বিষয়।

নারদ, সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের প্রার্থী হইয়াছিলেন। আমরা তদুপলক্ষে নারদের প্রশ্নাবলী ও সনৎকুমারের উত্তরাবলী শাস্ত্রে দেখিতে পাই। নারদ জিজ্ঞাসিলেন,—

"ভগবন্! নামের অধিক কিছু আছে কি?"

উত্তর—"নামের অধিক বাক্য।"

প্রশ্ন—বাক্যের অধিক কিছু আছে কি?

উত্তর—"বাক্যের অধিক মন।"

এইরূপে উভয়ের প্রশ্নোত্তর-প্রবাহ চলিয়া, উহা "প্রাণ" প্রসঙ্গে উপনীত হইল। এই "প্রাণ" হইতে অধিক আর কিছুরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সূত্রের মূল আলোচ্য-বিষয় ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্তিটি এই—

"ভূমানং ভগবো জিজ্ঞাসে, যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।"

হে আর্য্য! ভূমার জ্ঞান বাঞ্ছে মম মন।
যাঁহ'তে দেখেনা অন্য, শুনেনা জানেনা অন্য,
যিনি পূর্ণ, ভূমা তিনি হন॥
যাহা হ'তে দেখে অন্য, শুনে অন্য—জানে অন্য,
যে অপূর্ণ, 'অল্প' পদে তাহারি গণন॥

এই ভূমাবিষয়িণী উক্তির পরেই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, আশা হইতেও প্রাণ গরীয়ান্; সুতরাং এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, প্রাণই বুঝি ভূমা, যেহেতু প্রাণাপেক্ষা অধিকতর গরীয়ান্ আর কিছুরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বিচার্য্য বিষয়ই ব্রহ্ম, কিন্তু প্রাণ নহে। নারদ সেই জ্ঞানই পাওয়ার প্রার্থী হইয়াছিলেন, যে জ্ঞানে

"অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি"-রূপ পরম-পুরুষার্থ হয়; কিন্তু (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন) প্রাণ-তত্ত্ব-জ্ঞানের পরমপুরুষার্থদায়িনী শক্তির উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না; অতএব প্রাণ কদাচ 'ভূমা' হইতে পারে না। নারদকে সনৎকুমার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার শেষে "আশা হইতে প্রাণ অধিক" এইরূপ সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইলেই নারদ নীরব হইলেন; আর প্রশ্ন করিলেন না। তখন সনৎকুমার ব্যাখ্যা করিলেন যে, "অতিবাদী" হওয়ার উপযোগিতা কেবল প্রাণতত্ত্ব-জ্ঞানে নির্ভর করিলে, উহা অন্তঃসারশূন্য হয়; যেহেতু তত্ত্বতঃ প্রাণ স্বয়ংই মিথ্যা; এবং তৎপরে বলিলেন যে, তিনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্য-জ্ঞান-সম্পন্ন। এই স্থলে নারদ একটি নবতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রচ্ছক হইলেন এবং সনৎকুমারও তাঁহাকে বুদ্ধি হইতে ভূমাতত্ত্ব পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলেন। এই ভূমাতত্ত্ব প্রাণতত্ত্বের অতিরিক্ত ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলিতার্থে এই উভয় তত্ত্বে পরস্পর প্রকৃত সংস্রব নাই।

সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সম্প্রসাদ-তত্ত্বের পরে ভূমা-তত্ত্ব উক্ত হওয়ায়, প্রাণ কদাচ ভূমা নহে। "সম্যক্ প্রসীদত্যস্মিন্নিতি" এই অর্থে "সম্প্রসাদ" পদে সুষুপ্তি বুঝায়; কারণ সুষুপ্তিই সম্যক্ প্রসন্নতাপ্রদ। সুষুপ্তি-কালেও প্রাণ জাগ্রত থাকে; সুতরাং এই সূত্রে "সম্প্রসাদ" শব্দে প্রাণ বুঝাইলেও ভূমা শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়, কিন্তু প্রাণ বুঝায় না, কেননা ভূমাতত্ত্ব প্রাণতত্ত্বের পরে অতিরিক্ত তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"আত্মতঃ প্রাণঃ" (ছাঃ উঃ ৭-২৬।১।১) প্রাণ স্বয়ংই আত্মা

হইতে উৎপন্ন। আত্মাই মূল পদার্থ; আত্মা পদার্থান্তরসাপেক্ষ নহে। অতএব "ভূমার প্রতিষ্ঠা কোথায়?" নারদের এইরূপ প্রশ্নে উত্তর হইল যে,—"**স্বে মহিম্নি**" অর্থাৎ স্বমহিমায়। ইহাতেই সর্ব্ব-সংশয়ের নিরাকরণ হইতেছে। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ভূমা সেই বিশ্বকারণ পরমাত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

৯ম সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পবিত্র শাস্ত্রবাক্যে ভূমার যেরূপ লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মেই সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, অতএব ভূমাই ব্রহ্ম। "যাহাতে অন্য আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, (ইত্যাদি ইত্যাদি,) তাহাই ভূমা" এই বাক্যের সহিত "**যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ**" (বৃ: উ: ৪-৫। ১) এই বাক্যের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, যখন আত্মাই সমস্ত, তখন তাহাতে আর অন্য কি দৃষ্ট হইতে পারে?

ছান্দোগ্যোপনিষদের এই আলোচ্য অধ্যায়টীতে 'ভূমাকে' আনন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে, এবং অমৃততত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বকেও আনন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। অতএব লক্ষণসাম্য হেতু ভূমাই ব্রহ্ম, তাহাতে সংশয় নাই।

১০ম সূত্র—এ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৩—৮। ৭। ৮) উক্ত "অক্ষর" শব্দে অবিনাশী ব্রহ্মকে বুঝায় বা অক্ষর-পদেই বাচ্য অ-উ-ম-প্রকটিত প্রণব বুঝায়।

"**কস্মিন্ নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।**"

কিসে ওতঃপ্রোত এই অনন্ত অম্বর ?

ক'ন (যাজ্ঞবল্ক্য যোগী), অবধান কর গার্গি !'

বর্ণন করেন হেন ব্রাহ্মণনিকর,—

যে অম্বর এ ভুবন যা হ'তে করে পোষণ,

আধার সে অম্বরের সেই সে অক্ষর।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে অম্বর সর্ব্বাধার, তাহার আধার ব্রহ্ম ব্যতীত আর কে হইতে পারে ? এই অম্বর যে অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে বিশ্বের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিতেছে, তাহাই 'অক্ষর' অর্থাৎ অবিনাশী ব্রহ্ম। "ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্" অর্থাৎ প্রণবই এই সমস্ত বিশ্ব, এইরূপ উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনুপপত্তি নাই ; কারণ উক্ত বাক্য ওঁকারের স্তুত্যর্থক, যেহেতু প্রণবসাধনই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

১১শ সূত্র।—এ সূত্রের বিচার এই যে, 'অক্ষর' কদাচ অচিৎ-সত্ত প্রধানের প্রতিপাদক নহে।

"এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি। (বৃঃ ভঃ ৩-৮।৯।

হে গার্গি, এ অক্ষরের প্রশাসন-বলে।

চন্দ্র সূর্য্য স্ব স্ব কার্য্য সাধে নভস্তলে ॥

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, চিৎস্বরূপ হইতেই প্রশাসন সম্ভবে; সাংখ্যোক্ত অচিৎ-স্বরূপ প্রধান হইতে তাহা অসম্ভব। অচিৎসত্ত কর্দ্দমের প্রশাসনে কদাচ ঘটাদির সংঘটন সাধিত হয় না।

১২শ সূত্র।—এ সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ ব্রহ্ম এই

ভূত-প্রপঞ্চ হইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র পদার্থ, তদ্রূপ অক্ষরকেও শাস্ত্রে ভূত-প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম ও অক্ষরে যে কেবল লাক্ষণিক তত্ত্ব-সাম্যজনিত একত্ব, তাহা নহে, পরন্তু অন্যান্য অনিত্য-ভূত-প্রপঞ্চের সহিত পার্থক্য-সাম্য-জনিত একত্ব-ফলেও অক্ষরই ব্রহ্ম।

প্রধান ও জীবাত্মা হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব বিভিন্ন, অপিচ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, এবং অক্ষরও তাহাই বলিয়া বর্ণিত ; অতএব অক্ষরই ব্রহ্ম।

"अदृष्टं द्रष्टृ, अश्रुतं श्रोतृ, अमतं मन्तृ, अविज्ञातं विज्ञातृ।" (बृः उः, ३-८।११)। অর্থাৎ (হে গার্গি!) অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দেখেন, অশ্রুত হইয়াও শুনেন, অমত হইয়াও মনন করেন, অজ্ঞাত হইয়াও জানেন ইত্যাদি।

স্থলান্তরে, উক্ত অক্ষরে চক্ষু-কর্ণ-বাক্য-মনের অস্তিত্ব অসিদ্ধ, অথচ উহাতে তত্তৎ শক্তির কারণ-তত্ত্ব নিহিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা অক্ষরেরও সর্ব্বোপাধিশূন্যতা সিদ্ধান্তিত হওয়ায়, "অক্ষর" পদে পরমাত্মা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৩শ সূত্র।—প্রশ্নোপনিষদের (৫।২) একটি উক্তির বিচার এই সূত্রের বিষয়। উক্তিটি এই,—

"एतद्वै सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्माद् विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेतीति प्रकृत्य श्रूयते। यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीतेति।"

সত্যকাম! এ ওঙ্কার প্রণব-ব্রহ্ম অপর।
ইঁহারে জানিলে লভে এ দুয়ের অন্যতর॥

ত্রিমাত্র প্রণব এই, এতে ধ্যান ধরে যেই,
সেই পায় পরম পুরুষ পরাৎপর।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই ত্রিমাত্র প্রণবের ধ্যান-ধারণায় যে পরমপুরুষের প্রাপ্তি হয়, তাহা পরমাত্মা ব্রহ্ম বা অপর কোনরূপ আত্মতত্ত্ব বা দেবতত্ত্ব।

সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, ধ্যান-ধারণার বিষয় পরমাত্মা ব্রহ্ম। প্রকৃত বস্তুই প্রত্যক্ষ, সুতরাং ধ্যেয়; কিন্তু অপ্রকৃত বস্তু বা অবস্তু অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং অধ্যেয়।

"स एतस्मा जीवघनात् परात्परं पुरुषं पुरिशयम् ईक्षते"।

দেহ-দুর্গবাসী সেই পরম পুরুষে।
জীবঘন-আত্মা হ'তে প্রধান হেরে সে॥
(জ্ঞানেন্দ্রিয়—আর তার বিষয়-নিকর।
তদতীত তিনিই পুরুষ পরাৎপর॥)

উপরোক্ত ঔপনিষদী উক্তিদুটি ফলিতার্থে এক তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিতেছে। প্রকৃত বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, এই হেতুই এক মাত্র প্রকৃত বস্তু ব্রহ্মই উক্ত উক্তিদ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছেন; কিন্তু প্রাণ নহে। প্রাণ যদিও দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, কিন্তু ফলিতার্থে মায়াকল্পিত অবস্তু। গৌণ-ব্রহ্ম "হিরণ্যগর্ভ" বা "সূত্রাত্মা"ও প্রকৃতই অপ্রকৃত বস্তু বা অবস্তু। বেদান্তের সার সিদ্ধান্তই এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই বিশ্ব; ব্রহ্মই "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

১৪শ সূত্র—এই সূত্রেরও বিচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্রুতিবাক্য। নিম্নে সেটি উদ্ধৃত হইল।

"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।"

ব্রহ্মপুরী এই দেহ, সূক্ষ্ম হৃৎপদ্ম গেহ,
তাহে সূক্ষ্ম অন্তর-আকাশ।
আশ্রয়ি সে সূক্ষ্মধাম, যে তত্ত্ব বিরাজমান,
আবশ্যক সে তত্ত্ব জিজ্ঞাস।

বিচার্য্য এই, শাস্ত্র যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মপুরী এই দেহে সূক্ষ্ম হৃৎপদ্মধামে সূক্ষ্ম অন্তরাকাশতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, ইহার সারভূত তত্ত্ব বা লক্ষ্য কি, তাহাই অনুসন্ধেয়। উহা কি কেবল ভৌতিক সূক্ষ্মব্যোম মাত্র? অথবা উহা জীবাত্মা, কিম্বা সেই পরাৎপর পরমাত্মা? পরবর্ত্তী বিচারমতে শাস্ত্রোক্তি অনুসারেই "সূক্ষ্ম অন্তরাকাশ" পদে ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞেয়। নিম্নোক্ত বর্ণনানুসারে অন্তরাকাশ গৌণ গণ্য।

"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।"

শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ. অজর অমর নিত্য,
অশোক—অক্ষুত্তৃষ্ণ যেই।
যিনি সদা সত্যকাম, সত্যের সঙ্কল্পবান,
হন সত্য এই আত্মা সেই॥

এই বর্ণনা ভৌতিক আকাশ বা জীবাত্মা, এ দুয়ের কোনটীতেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। শালগ্রাম-শিলায় যদ্বৎ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, ধ্যানধারণাধিগম্যভাবে "ব্রহ্মপুর" দেহমধ্যে হৃৎপদ্মে তদ্বৎ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান।

১৫শ সূত্র।—এই সূত্রের সমাধেয় এই যে, সূক্ষ্মব্যোম বা পরব্যোম ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। পরব্যোমে বা ব্রহ্মলোকে জীবের প্রাত্যহিক গতিবিশেষ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুগভীর সুষুপ্তিসময়ে জীবাত্মার ব্রহ্মগতি বা ব্রহ্মলোকে গতি এবং জাগরণে পুনরাবৃত্তি হয়। ব্রহ্মলোক ব্রহ্মের আধিকরণিক তত্ত্ব, সুতরাং পরমার্থতঃ ব্রহ্মসহ অভিন্ন, ইহাই এস্থলে বিবৃত।

১৬শ সূত্র।—এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, সূক্ষ্মব্যোমের জগদ্ধৃতি-লক্ষণ উক্ত হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই বোদ্ধব্য, যেহেতু ব্রহ্মেরই জগদ্ধৃতি-লক্ষণ শ্রুতি-বিশ্রুত। শাস্ত্রে এই সূক্ষ্ম ব্যোমতত্ত্বকে কেবলমাত্র পাপাত্রীতই বলা হয় নাই; অপিচ বলা হইয়াছে, ইহাদ্বারা এরূপ নিয়মিত ভাবে জগৎ পোষণ হইতেছে যে, যাহাতে জগৎ বিপ্লুত না হইয়া যায়। যথা "**য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়েতি**"। "বৃহদারণ্যক" বলেন, একমাত্র সেই অমৃতস্বরূপের আদেশেই আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য যথাবিহিতভাবে স্বকার্য্য-সাধনার্থ সমুদিত রহিয়াছেন। মূল-ব্রহ্মত্ব-বশেই বিশ্বের সর্ব্ব পদার্থই স্বসত্তায় সংস্থিত, অতএব "সূক্ষ্মাকাশ" বা "পরব্যোম" পদে ব্রহ্মতত্ত্বই বোধিত।

১৭ সূত্র।—এই সূত্রের সমাধেয় এই যে, সূক্ষ্মব্যোম ব্রহ্মতত্ত্ববোধক; যেহেতু ইহার অন্যান্য অবান্তর অর্থ থাকিলেও এস্থলে মুখ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থই ব্রহ্ম। "**আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা**" (ছা: উ: ৮। ১৪)

আকাশ-পদেতে হন পরিব্যক্ত যিনি।
নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক তিনি॥

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে।"
(ছা: উ: ১।৯)

আকাশপদেতে যাঁর পরিচয় জ্ঞাত।
এই সর্ব্বভূত হয় তাঁহাতেই জাত॥

'আকাশ' পদে অবশ্য জীবাত্মা বুঝায় না, ইহা ভৌতিক ব্যোমকেই বুঝায়; কিন্তু সূক্ষ্মব্যোমের যে লক্ষণাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তদ্দারা ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞেয়; নচেৎ উহা অতীব অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হয়।

১৮শ সূত্র।—ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, সূক্ষ্মব্যোম কদাচ জীবাত্ম-বোধক হইতে পারে না; যেহেতু শাস্ত্রোক্তিমতে উহা অসম্ভব। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৮৩। ৪) উক্ত হইয়াছে,

"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ।"

এই যেই 'সম্প্রসাদ'—দিব্য-বিভাসিত।
এ মর্ত্ত্য শরীর হ'তে হ'য়ে সমুত্থিত॥
পরজ্যোতিরূপে পরে পরিণতি পায়।
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আত্মা বলে তায়॥

এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ বা আপাততঃ জীবাত্মাই সমর্থিত বোধ হয়; কিন্তু (এই পাদেরই) পরবর্ত্তী ২০শ সূত্রে নিষ্পন্ন হইবে যে, মুখ্যার্থক-ভাবে বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গই পরমাত্মবোধক। ফলিতার্থে

উপরোক্ত উপনিষদ্‌-বাক্যেও পরমাত্মাই পরম লক্ষ্য। কারণ স্বরূপস্থ আত্মাই পরমাত্মা, যেহেতু উপাধি-নির্ম্মুক্ত; কিন্তু জীবাত্মা সোপাধিক ও সসীম; এবং "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" বা "অপহতপাপ্মা" প্রভৃতি বিশেষণ জীবাত্মায় অপ্রযোজ্য। জীবাত্মা অবিদ্যোপাধিগত; অবিদ্যাতেই অজ্ঞান, অজ্ঞানেই পাপ; অতএব সূক্ষ্মব্যোম সহ জীবাত্মা তুলনীয় নহেন; পরন্তু পরমাত্মাই তুলনীয় বটেন।

১৯শ সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে জীবাত্মার বিষয় কথিত হওয়ায়, "সূক্ষ্মব্যোম" জীবাত্মবোধক কেন না হইবে? এরূপ তর্ক উত্থাপিত হইলে, তদুত্তর এই যে, উহাতে মুক্ত জীবাত্মার বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে; মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক তত্ত্ব। "**ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।**" জীবাত্মা যখন অবিদ্যা মুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ হন, তখন তিনি ব্রহ্মই হন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রজাপতি কর্ত্তৃক জীবাত্মার প্রকৃত-তত্ত্ব বিকাশ বিবৃত হইয়াছে। মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মায় তত্ত্বপক্ষে প্রভেদ নাই। যদি "সূক্ষ্মব্যোম" মায়াপাশ-মুক্ত জীবাত্মাকে লক্ষ্য করে, তবে তাহা পরমার্থতঃ পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করে, বলা যায়।

২০ সূত্র।—এ সূত্রের বিচার এই যে, যদি সূক্ষ্মব্যোম জীবাত্মাকে বুঝায়, তবে তাহার অর্থ-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য; অর্থাৎ তদ্দারা প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার স্বরূপ-নির্ণয় অভিপ্রেত নয়, পরন্তু পরমাত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ই অভিপ্রেত।

২১শ সূত্র।—যদি এরূপ তর্ক ধরা যায় যে, সূক্ষ্মব্যোমের সূক্ষ্মস্বরূপ লক্ষণটী বিশ্বব্যাপী পরমাত্মায় কিরূপে প্রযোজ্য হইতে

পারে? তদুত্তরে বলা যায় যে, তিনি এই রূপেই ধ্যানাধিগত হইয়া থাকেন।

ঔপনিষদী শ্রুতি কেবল আমাদিগকে আমাদের ধারণাধিগম্য-ভাবে সূক্ষ্ম-হৃৎপদ্মে ব্রহ্মচিন্তার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষুদ্রত্বরূপ সূক্ষ্মত্ব জ্ঞাপন করেন নাই।

২২শ সূত্র।—মুণ্ডকোপনিষদ্ ও কঠোপনিষদুক্ত একটি শ্রুতি-বাক্যের বিচার এই সূত্রের বিষয়। শ্রুতি যথা—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

(মুঃ ভঃ ২২-২। ১০)

সূর্য্য তথা নাহি জ্বলে, নাহি চন্দ্র-তারা তথা।
নাহি ঝলে এ বিদ্যুৎ, অগ্নি আর লাগে কোথা॥
তিনি ভান্ত, সর্ব্বভাতি তাঁরে অনুসারি রয়।
তাঁহারি বিভায় এই বিশ্ব বিভাসিত হয়॥

এই স্থলে এই ভাতি বা জ্যোতি, কোন ভৌতিক জ্যোতিষ্ককে লক্ষ্য করিতেছে না; এস্থলে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মই লক্ষিত। শাস্ত্রে ব্রহ্মই "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মই মৌলিক আলোচ্য বিষয়, অতএব সিদ্ধান্তিত তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব,—অপর কোন ভৌতিক তত্ত্ব নহে।

২৩শ সূত্র।—ঔপনিষদী স্মৃতিও ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্যোতির অপ্রকাশ্য

স্বয়ম্প্রকাশ—অর্থাৎ "জ্যোতির জ্যোতি" ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন; যথা গীতা—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

রবি না বিভাসে তাহা, না চন্দ্র না অগ্নি তথা।
সে মম পরমধাম, নাহি ফেরে গেলে যথা॥

অপিচ—"**যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।**
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।"

আদিত্যগত যে তেজ, বিকাশে বিশ্বসংসার।
যে তেজ চন্দ্রে—অনলে, সে তেজ জান' আমার॥

এতাবতা "জ্যোতির জ্যোতি" ভাবে, অন্য কোন ভৌতিক জ্যোতিই প্রতিপাদিত নহে; পরন্তু পরমাত্মা পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

২৪। **শব্দাদেব প্রমিতঃ।**

২৫। **হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।**

২৪। "ঈশান" শব্দের দ্বারা "অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ" পদে পরম পুরুষ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।

২৫। বেদবাক্যার্থ-ধারণে মনুষ্যাধিকার থাকাতেই, ব্রহ্মের মনুষ্য-হৃদয়-গম্যতা হেতু, "অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র" বিশেষণে—সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই এস্থলে বিশেষিত বা বেদিত হইয়াছেন।

এই দুইটী সূত্রে একটী অধিকরণ রচিত।

২৪। সূত্র—কঠোপনিষদ্ (২-৪। ১২) বলেন,—

"অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।"

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ যিনি।
আত্মমধ্য-নিত্যনিবাসী তিনি॥

অপিচ,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ
ঈশানো ভূত-ভব্যস্য সএবাদ্য স উশ্বঃ এতদ্বৈতত্।"

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ যিনি।
অধূমিত জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি॥
ভূত-ভবিষ্যের ঈশ্বর যিনি॥
অদ্য-কল্য-সম, তাহাই তিনি॥

"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ" পদে সোপাধিকত্ব ভাব থাকাতেও জীবাত্মা বুঝায় না; পরন্তু উক্ত পদে পরমাত্মা ব্রহ্মই বিস্পষ্ট বেদিতব্য, ইহাই সূত্রে আলোচিত ও সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদের মূল মীমাংসিতব্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব। নচিকেতা যমের নিকটে, সেই বেদাতীত, কার্য্যকারণাতীত তত্ত্বই জানিতে চাহিয়াছিলেন, যথা—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি, তদ্বদ।"

(কঃ উঃ ১—২।১৪।)

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঔপনিষদ "এতদ্বৈতত্" বাক্যে অনুসন্ধেয় ব্রহ্মতত্ত্বের নিরূপণই "অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত" পদে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কারণ, পরে বিশদরূপেই বর্ণিত হইয়াছে যে, "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ" ভূত-ভবিষ্যের প্রভু। পরাৎপর পরমাত্মা পরব্রহ্ম ব্যতীত ভূত-ভবিষ্যের ভর্ত্তা কর্ত্তা আর কে হইতে পারে?

২৫ সূত্র—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পদে ব্রহ্মতত্ত্বই কেন বিজ্ঞেয়, এই সূত্রে

সেই প্রশ্ন ও তাহার সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। বেদ-বিদ্যায় মানবের অধিকার প্রসারিত, তাহাতেই পরমাত্মা ব্রহ্মের জ্ঞান মানবের লভ্য হইয়াছে; সুতরাং হৃদয় দ্বারা লভ্য—সেই হৃদয়বাসী হৃদয়েশ্বরের জ্ঞান, তাঁহাকে এস্থলে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পদেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয়-স্বরূপে প্রকাশ করিতেছে। হৃদয় পরমাত্মার অধিষ্ঠানরূপেই শ্রুত্যুক্ত হইয়াছে; সেই হৃদয়ের পরিমাণ শাস্ত্রানুসারে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত "দীপকলিকাবৎ।" অতএব এস্থলে হৃদয়-স্বরূপে উপলক্ষিত ব্রহ্ম "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পদেই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

বেদবিদ্যাধিকার দ্বারা মানবের এই ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞানাধিকার বিষয়ের আলোচনায়—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণেরই বেদাধিকার বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। আচার্য্য-প্রবর, মহর্ষি জৈমিনিকৃত "পূর্ব্বমীমাংসা"-দর্শনের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শূদ্র, বেদ-বিদ্যার অধিকারী নয়। সূত্রের "মনুষ্য" শব্দের প্রকৃতার্থে মনুষ্যাকৃতিধারী মাত্রই প্রতিপাদ্য নহে; পরন্তু "অধিকারী মানব"ই প্রতিপাদ্য। সে অধিকার বা যোগ্যতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই "দ্বিজ" ত্রিবর্ণ ব্যতীত শূদ্রে সম্ভবে না। আমরা এই বিষয়টী ৩৪—৩৮ সূত্রের ব্যাখ্যার সময় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যেহেতু উক্ত সূত্রদ্বয়ে এ তত্ত্ব পুনরালোচিত হইয়াছে।

এই সূত্র প্রকারান্তরে শিক্ষা দিতেছে যে, জীবাত্মা পরমার্থতঃ পরমাত্মা সহ অভিন্ন; পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যই

"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের সিদ্ধান্ত-রহস্য। পশ্চাদুক্ত বাক্যে এই সিদ্ধান্ত সুবিশদ হইতেছে যে, হৃদয়-স্বরূপ অন্তরাত্মার হৃদয়-পরিমিত আয়তন অঙ্গুষ্ঠমাত্র; এই হৃদয়ায়ত্ত অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা জীব-হৃদয়াধারে নিত্যাধিষ্ঠিত। যথা—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জা-
দিবেষিকাং, ধৈর্য্যেণ তং বিদ্যাৎ
শুক্রমমৃতমিতি।" (কঃ উঃ ২-৬।১৭)

"অন্তরাত্মা পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত।
সদা জনগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত॥
তৃণ হ'তে গর্ভতৃণ-গ্রহণ যেমন,
তথাবৎ দেহ হ'তে হৃদি-উন্মোচন।
দেহ-সার হৃদি, তাই আত্মা হৃদিরূপ।
জানিবে যে ব্রহ্মজ্যোতি অমৃত-স্বরূপ॥

২৬। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।
২৭। বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেক-প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।
২৮। শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং।
২৯। অতএব চ নিত্যত্বম্।
৩০। সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎস্মৃতেশ্চ।
৩১। মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।

३२। ज्योतिषि भावाच्च ।

३३। भावस्तु बादरायणोऽस्ति हि ।

২৬। সম্ভাবনানুসারে মানবাধিক উন্নত প্রাণীগণের বেদবিদ্যায় অধিকার, ইহাই বাদরায়ণের মত বা সিদ্ধান্ত।

২৭। দেবগণের মূর্ত্তত্ব বা সাকারত্বের সত্যতা বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে, তাহা অগ্রাহ্য; যেহেতু দেবগণের বিবিধ সাকারসত্ব ধ্যান-লভ্য ও সিদ্ধ সাধকের দ্রষ্টব্য।

২৮। যদি এরূপ বলা যায় যে, "শব্দ" পক্ষে অনুপপত্তির আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তবে সে আপত্তি সর্ব্বথা অপ্রতিপন্ন; যেহেতু শব্দই জগতের মূলতত্ত্ব। শব্দ হইতেই জগৎ সমুৎপন্ন। প্রত্যক্ষ (বেদ-শ্রুতি) ও অনুমিতি, এতদুভয় দ্বারাই এই সত্য সিদ্ধান্তীকৃত। 'প্রত্যক্ষ' অর্থ এস্থলে শ্রুতি, এবং 'অনুমান' স্মৃতি।

২৯। অতএব বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ।

৩০। নাম-রূপ উপাধির সমত্ব বশতঃ জগতের নবস্থষ্টির সময়ে বেদবাণীর এই নিত্যতা অনুপপন্ন নহে।

৩১। জৈমিনির মত এই যে, দেবগণ বেদ-স্বাধ্যায়শীল হইতে পারেন না, যেহেতু "মধুবিদ্যা" প্রভৃতি বিষয়ে তাহার অসম্ভাবনাই প্রমাণিত।

৩২। দেব-সংজ্ঞা-সূচক শব্দ সকল জ্যোতিঃ স্বরূপেই দেবতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়াও দেবগণের (পূর্ব্বোক্ত) অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৩। পক্ষান্তরে, বাদরায়ণ, শ্রুত্যুক্তি আছে বলিয়াই, সেই আপ্ত প্রমাণ-বলে দেবগণের ব্রহ্ম-বিদ্যাধিকারের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন।

২৬ হইতে ৩৩ সূত্র একটী অধিকরণ।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মানবগণ বেদ-বিদ্যায় অধিকারী; কিন্তু তদ্দ্বারা এমন কোন বাধকবিধি ব্যবস্থিত হয় নাই যে, দেবগণ বেদবিদ্যাধিকারে বর্জ্জিত। এতাবতা মহর্ষি বাদরায়ণের বিচারিত সিদ্ধান্ত এই যে, মানবাধিক শ্রেষ্ঠতর চিৎসত্ব (যথা ইন্দ্র প্রভৃতি) দেবগণ অবশ্য বেদবিদ্যাধিকারী; যেহেতু এ বিষয়ে সম্ভাবনার সুবিদ্যমানতা আছে। পক্ষান্তরে, বেদাধিকারের উপযোগিতা এইরূপে বিবেচিত হইবে, যথা—প্রথমতঃ দেবগণেরও মানবগণের ন্যায় মুমুক্ষুত্ব থাকার সম্ভাবনা, যেহেতু একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহারাও মায়া-সৃষ্ট, উপাধিবিশিষ্ট ও অনিত্যপ্রতিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহারাও মানবের ন্যায় কোন না কোনরূপ অনতীন্দ্রিয় স্থূল মূর্ত্তি ধারণ করেন। তৃতীয়তঃ, ইহাতে কোন বাধাই কল্পিত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ, বেদাধিকারপ্রদ উপনয়ন সংস্কার তাঁহাদের পক্ষে না থাকিলেও, উহাই যে স্বাধ্যায়াধিকারের অবশ্য নির্দ্দিষ্ট অব্যবহিত পূর্ব্ব-বর্ত্তী প্রয়োজনানুষ্ঠান, এমন কোন কথা নাই। মানবের উপনয়ন-সাধ্য সংস্কারে দেবগণ স্বতঃশ্রেষ্ঠতা বশতঃ স্বতঃসিদ্ধই হইতে পারেন।

অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে, বর্ত্তমান ও পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রনিচয়ের সিদ্ধান্ত-বিচার দেবগণপক্ষেই প্রয়োজনীয়; কিন্তু মানব-গণপক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ইন্দ্র বা তাঁহার সজাতীয় দেবগণ বেদ-বিদ্যায় অধিকারী কি না, এবং তাঁহাদের সাকার-দেহসত্তা সত্য কি

না, এসব বিষয় এতৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী মধ্যযুগের বিদ্যার্থিগণের বিচার্য্য ও আলোচ্য ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানযুগের পাঠকবর্গের বোধ হয় সে সম্ভাবনা বড় কিছু নাই। ফলে যাঁহাদের এরূপ ধারণা, তাঁহাদের ভ্রান্তি-নিরসন অবিলম্বেই হইবে ; কারণ পরবর্ত্তী সূত্রে এই আপাত-সামান্য বিষয়টির সমস্যাতেই শব্দ-বিজ্ঞানের গুরুতম তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এক পক্ষে প্রতিপক্ষীয় বিতর্ক এই যে, যদি দেবগণের মূর্ত্তসত্তা স্বীকার করা যায়, তবে বেদোক্তি মতে দেবগণের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভাবিত হয় ? কারণ, একই দেব বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে একই মূর্ত্তসত্তায় কিরূপে আবির্ভূত হইতে পারেন? উত্তর এই যে, শাস্ত্রে জানা যায়, এক-দেবই বহুমূর্ত্তি-ধারণে সমর্থ। অধিক কি, শাস্ত্র বলেন, মনুষ্যও যোগসিদ্ধ-শক্তিতে বহুমূর্ত্তি-ধারণে সমর্থ। অতএব, স্বতএব মনুষ্যাধিক শ্রেষ্ঠতর শক্তিসম্পন্ন দেবগণ যে একই সময়ে বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে বিভিন্নমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে।

দেবগণের মূর্ত্তসত্তা-স্বীকারে, যজ্ঞকার্য্য সম্বন্ধে কোন অসঙ্গতি সম্ভাবিত নহে, কিন্তু শব্দ সম্বন্ধেই যে কিছু অসঙ্গতির আপত্তি বা প্রতিবাদ। দেবগণ মূর্ত্তসত্ত হইলে, তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুরও বিষয়ীভূত বটে ; যেহেতু সোপাধিক বা মূর্ত্তসত্ত অবশ্য অনিত্য। অতএব বহুদেবনাম-ময় শব্দাত্মক বেদও অনাদি অনন্ত হইতে পারে না। নিত্য শব্দের সহিত অনিত্য বিষয়ের নিত্যসংযোগও অনিত্য অর্থাৎ নাশশীল হয় ; সুতরাং বেদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্য,—ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের অনিত্য সত্ব স্বীকার করেন, এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, দেবগণ, অপর প্রাণীগণ—এক কথায়—সমগ্র জগৎই শব্দ বা বেদ হইতে সমুৎপন্ন। এই শব্দ বা বেদই ব্রহ্ম। "শব্দব্রহ্ম" এই বিখ্যাত বাক্য, সাধক হিন্দু মাত্রেরই বিদিত। শব্দশাস্ত্রের গ্রন্থকার পাণিনিও "শব্দ-শাস্ত্রাধ্যায়ীই প্রত্যক্ষের অতীত মোক্ষাধিকারী" এই যে মত প্রকাশ করেন, তাহারও একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। শঙ্কর বলেন, প্রত্যেক পদার্থের মূলতত্ত্ব শব্দে নিহিত। ফলে উহা পদার্থের স্বাতন্ত্র্যগত নহে, কিন্তু জাতিগত ভাবে। কারণ, পদার্থ সংখ্যায় অনন্ত। স্বাতন্ত্র্যগত বা সোপাধিক বস্তু বা দেবগণের অবশ্য মূল আছে, এবং অবশ্য উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে, কিন্তু জাতিগত মূলতত্ত্ব তদতীত। চিৎস্বরূপে এবং বাক্যরূপে তাহা প্রথমে ব্রহ্মকর্ত্তৃক ব্যক্ত।

যাহাহউক, ব্রহ্মকর্ত্তৃকই এই সোপাধিক জড়জগৎ সৃষ্ট, কিন্তু শব্দ কর্ত্তৃক নহে। শব্দ বা বেদ কেবল প্রতিবস্তুগত নিত্যতত্ত্বের অভিব্যক্তিস্বরূপ। স্বাতন্ত্র্যগত সোপাধিক বিভিন্ন পদার্থসমূহ এতদনুসারেই সমুৎপন্ন।

শঙ্করাচার্য্য শ্রুত্যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। "**মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ।**" (বৃঃ ভঃ, ১।২।৪) অর্থাৎ তিনি মনদ্বারা বাক্যে যুক্ত হইলেন। অপিচ,—

> "**অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।**
> **আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥**
>
> (মঃ ভাঃ, ১২-৮৫৩৪)

অনাদিনিধনা নিত্যা স্বয়ম্ভূতা যিনি——
বেদবাণী, বিশ্ববাণী-বিকাশিকা তিনি ॥

বেদ বা বাণীর বিশ্বমূলত্ব-প্রতিপাদনে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বিচার-প্রণালী এইরূপ।—আমরা যখনই যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি, তখনই সেই বিষয়ের স্মরণসূচক নাম, সংজ্ঞা বা বাণী সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে উদিত হয়। যেই ইচ্ছার উদয়, সেই বাণীর উদয়। নির্গুণের প্রথম সগুণত্বই ইচ্ছা। আর সগুণত্বের প্রথম বিকাশই বাণী। রজোগুণে, আদি সগুণসত্ব প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াই, জগদুপাদানভূত পদার্থের সংজ্ঞা স্বরূপ শব্দের স্মরণ করিয়াছিলেন। **"স ভূরিতি ব্যাহরন্ স ভূমিমসৃজত্।"** (তৈ: ত: ১১-৩ ৪ ২) ভূমিসৃষ্টির বিষয় স্মরণ করিতেই, সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়ে "ভূ" শব্দের উদয় হইল। অমনি তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি "ভূ" বলিয়া ভূ-সৃষ্টি করিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও এই তত্ত্ব এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—"God said let there be light, and there was light." ঈশ্বর বলিলেন "জ্যোতি হউক্" অমনি জ্যোতি হইল। ফলে শব্দাত্মক বেদের অনাদিনিধনত্ব ও জগন্মূলত্বের রহস্য "শব্দব্রহ্ম"-তত্ত্বেই নিহিত।

বেদ, বাক্ বা শব্দ বস্তুতঃ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের স্থূলতত্ত্বাতীত তত্ত্ব। এ তত্ত্ব বাক্যের বীজ-সঙ্কেতবৎ জাগতিক সৃষ্টপদার্থের সৃষ্টিমূলক প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা চিত্তত্ত্ব ধারণ করে। সৃষ্টিশক্তির মূল হেতুসত্ব স্বরূপ সূক্ষ্ম শব্দবিজ্ঞান-রহস্য পাশ্চাত্য প্লেটোশিষ্যগণের বহু পূর্ব্বে হিন্দুর জ্ঞানাধিগত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ

১০ম (১২৫) ও অথর্ব্ববেদ ৪র্থ (৩০) বাণীর স্বগতোক্তি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

১। অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥

আমি বরুণের সহিত ভ্রমণ করি, রুদ্রের সহিত ভ্রমণ করি, আদিত্যের সহিত ভ্রমণ করি, বিশ্বদেবের সহিত ভ্রমণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়ের ভরণ করি। আমি অগ্নির ভরণ করি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ভরণ করি।

২। অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥

আমি সোমকে পোষণ করি; ত্বষ্টা, পূষণ এবং ভগকে পোষণ করি। যাঁহারা সোমকে পোষণ করিয়া সোৎসাহে যজ্ঞ করেন, হোম করেন, দান করেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন বিতরণ করি।

৩। অহং রাষ্ট্রী-সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভুরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তঃ॥

আমি রাজ্ঞী, আমি ধনসংগ্রহিত্রী, আমি জ্ঞানবতী, আমি যজ্ঞোপাস্যগণের প্রথমা। দেবগণ আমাকে বহুস্থানে বহুবিষয়ে বহুভাবে অন্তর্নিবিষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন।

৪। ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধেয়ং তে বদামি॥

যিনি দর্শন, প্রাণন, শ্রবণ ও ভোজন করেন, তিনি অজ্ঞাত-ভাবে ফলিতার্থে আমাদ্বারাই তৎসমস্ত করেন। তোমরা সকলে শ্রবণ কর, যাহা শ্রদ্ধেয়—অর্থাৎ সত্য, তাহাই আমি তোমাদিগকে বলি।

৫। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবানামুত
মানুষাণাম্॥
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥

যাহা মনুষ্য ও দেবগণের পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহাই আমি স্বয়ং বলিতেছি। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে জগন্নির্ম্মাণক্ষম ঈশ্বর করি, তাহাকে ব্রহ্মা করি, তাহাকে ঋষি করি, সুমেধা করি।

প্রাচীন টীকাকারগণের মতে "প্রত্যক্ষ" অর্থে শ্রুতি বা ঐশ-বাণী, এবং "অনুমান" অর্থে স্মৃতি বা পুরাণ। এই পরোক্ত শাস্ত্র স্মৃতি-পুরাণ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র বেদের অবিরোধী হইলেই প্রমাণ।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"

বেদ-স্মৃতি-পুরাণে যে আপাত-বিরোধ ঘটে।
বেদই প্রমাণ তায়; অন্য দুয়ে স্মৃতি বটে॥

বৈদান্তিকগণ তাঁহাদের দর্শনের মুখ্যতম প্রমাণরূপে বেদকেই মান্য করেন; তাঁহারা কেবল যুক্তি-তর্কমাত্রে নির্ভর করেন না। শঙ্করাচার্য্য বলেন, এক মাত্র শ্রুতি-প্রমাণে নির্ভর করা যায়, কিন্তু একমাত্র যুক্তিপ্রমাণে নির্ভর করা যায় না। অতি চতুরের যুক্তি-তর্কও তদধিক চতুরের দ্বারা খণ্ডিত হয়; অতএব প্রমাণ বিষয়ে

যুক্তি-তর্ককেই নির্ভর-ভিত্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে। যুক্তি-তর্কের পরিবর্ত্তনশীল অদৃঢ় ভিত্তি উপেক্ষা করিয়া, শঙ্করাচার্য্য তৎপ্রমাণিত নিত্য অপরিবর্ত্ত্য বেদ-ভিত্তিতে স্বীয় সেব্য বেদান্তদর্শনের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্ত-দার্শনিকেরা কোনরূপ অযৌক্তিক সংস্কারের বাধ্য নহেন, কিন্তু শ্রুতির স্বয়ং-প্রামাণিকতায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহাদের মত এই যে, আলোকের প্রামাণ্য যেমন আলোকান্তরসাপেক্ষ নয়, অর্থাৎ আলোক যদ্রূপ স্বয়ম্প্রকাশ, বেদ তদ্রূপ স্বয়ম্প্রমাণ। আলোক যেরূপ আকৃতি ও বর্ণের প্রমাণ, বেদও তদ্রূপ সর্ব্বতত্ত্ব—সর্ব্বসত্যের প্রমাণ।

ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ—যাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতুল্য প্রতিভায় আমরা চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাই, তাঁহারাও বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করেন। তবে কি না, "সংহিতা" ও "ব্রাহ্মণ" নামধেয় কতিপয় পুস্তকবিশেষের স্থূল ভৌতিক সত্তাকেই যে তাঁহারা নিত্য ও অভ্রান্ত বলেন, ইহা বলিলে, তাঁহাদের সেই বিশ্ব-বিকাশিনী বোধশক্তিকে বিদ্রূপ করা হয় মাত্র। কতিপয় জড় সন্দর্ভ বা বাক্যসমষ্টিই তাঁহাদের সেই নিত্য সত্য সনাতন "বেদ" নয়; প্রকৃত বেদতত্ত্ব অতি গভীর। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদ, শব্দ বা বাক্ এবং ব্রহ্ম পরমার্থতঃ একতত্ত্ব; এক তত্ত্বেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দ-সংজ্ঞা মাত্র। "বিদ্" ধাতুর অর্থ জানা। যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাই বেদ। অতএব বেদই জ্ঞানস্বরূপ। শব্দই জ্ঞানের প্রবর্ত্তক, অতএব অব্যবহিত কার্য্য-কারণত্বজন্য শব্দ ও জ্ঞান মূলতঃ এক তত্ত্বান্তর্গত। শব্দই সগুণাত্মিকা ঐশী ইচ্ছার আদি অভিব্যক্তি।

এই সিদ্ধান্তেই প্রতিপন্ন হয় যে, শব্দ, বাক্ বা ব্রহ্ম নিত্য, সত্য, শাশ্বত, স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বয়ম্প্রমাণ। অতএব শব্দ বা ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ; সেই জ্ঞানই বেদ; এবং নিত্য সত্যজ্ঞানস্বরূপ সেই বেদেই আর্য্যর্ষিদিগের সিদ্ধপ্রামাণ্য স্বীকৃত। বেদান্তদার্শনিকগণ কতিপয় স্থূল গ্রন্থমাত্রেতেই যদি স্বয়ম্প্রমাণ বেদত্ব বোধ করিতেন, তবে তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞান-প্রতিভার প্রসূত বিষয় মাত্রই বালকত্ব-মাত্রে পর্য্যবসিত হইত। ফলে যাঁহারা প্রকৃত বেদবিৎ তাঁহারাই প্রকৃত বৈদান্তিক।

তৎপর, জগদুৎপত্তির মূলতত্ত্ব—শব্দের যথার্থ স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক "স্ফোট" পদের তাৎপর্য্য এই স্থলে বিচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য বলেন, যদ্রূপ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার উপক্রমে সেই বিষয়ের সংজ্ঞাত্মক শব্দ আমাদের চিন্তায় উদিত হয়, তদ্রূপ জগৎ-সৃষ্টির উপক্রমে প্রজাপতির চিত্তে শব্দের উদয় হইয়াছিল।

হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্র সমূহে শব্দতত্ত্ব-সমস্যা বিশেষ বিচক্ষণতা ও ধীরতা সহযোগে বিচারিত হইয়াছে। "শব্দ" অর্থে পদ এবং ধ্বনি বুঝায়। অতএব প্রথমতঃ "ধ্বনি" কি, তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনে এবিষয় বিশিষ্ট ধীরতার সহিত এইরূপ বিচারিত হইয়াছে যে, ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় বটে; ফলিতার্থে উহা কোন বস্তু বা ক্রিয়া নহে; কিন্তু আকাশ বা ব্যোমের ভৌতিক গুণ-বিশেষ। বায়ু ইহার স্বরূপবাহক নহে; ইহার উচ্চতা বা শ্রুতি-যোগ্যতা বায়ুসাপেক্ষ হইলেও, ইহার গুণ বা স্বরূপ

বায়ুসাপেক্ষ নহে। এতাবতা ধ্বনি এবং পদ নিত্য-শব্দতত্ত্বের সাময়িক স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র। বাদনদণ্ডের আঘাতে একটি ঢক্কা বাদিত হইলে, ঢক্কা ও দণ্ডের সম্মিলনে ধ্বনি সমুৎপাদিত ও বায়ু দ্বারা বাহিত হয়। জৈমিনি-শিষ্য মীমাংসাদার্শনিকগণের মত এই যে, শব্দ নিত্য। তাঁহারা প্রথমতঃ শব্দের নিত্যত্ব-নিরাসক যুক্তি এইরূপে (পূর্ব্বপক্ষ স্বরূপে) গ্রহণ করেন, যথা,—

১। শব্দ নিত্য হইতে পারে না, যেহেতু ইহা উৎপন্ন।

২। ইহা বাহিত হইয়া বিলীন হয়।

৩। ইহা গঠিত বা কৃত হয়, তজ্জন্য বর্ণসমূহকে অকার-ককারাদি বলা যায়।

৪। ইহা বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক যুগপৎ অনুভূত হয়।

৫। ইহা পরিবর্ত্তনশীল, যথা ইহা "দধি অত্র" হইয়া আবার "দধ্যত্র" রূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

৬। ইহা শব্দকারীর সংখ্যাধিক্যে আধিক্য প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর মীমাংসকগণ এই সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ নিম্নোক্ত-প্রকার উত্তর পক্ষে উপনীত হন—

"শব্দ নিত্যই বটে। যদিও ইহার অনুভূতি উভয় দিকেই তুল্য, তথাপি আমাদের এ সিদ্ধান্ত সত্য যে, শব্দ নিত্য অর্থাৎ সদাস্থিত বা শাশ্বত। কেবল উচ্চারক বা উত্তেজকের সাপেক্ষতায় ইহা সতত ভৌতিক সত্তায় অনভিব্যক্ত। "ক" এই শব্দটি যে শ্রুত হইল, ইহা সেই শব্দই, যাহা নিত্য শব্দিত হইয়াছে ও হইতেছে! যদি বলা যায় যে "একটি শব্দ করা হইল" তবে তাহার যাথার্থ্য

এই যে, একটি শব্দকে ভৌতিক ব্যবহারে আনা হইল, এবং যুগপৎ বহুব্যক্তি-দৃশ্যমান সূর্য্যবৎ ইহার অনুভূতি বা অভিব্যক্তি সিদ্ধ হইল। শব্দের বিকার বা পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই এক শব্দই বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয় না; পরন্তু ইহা অপর শব্দ; শ্রোতার বোধাধিকারগত ভাবে সেই একের স্থান-পূরক মাত্র। আর শব্দের যে বৃদ্ধি বা আধিক্য, তাহা বায়ুর সংযোগ-বিয়োগের পরিমাণগত বৃদ্ধি বা আধিক্য-সাপেক্ষ। অপর, শব্দ বা বাক্য যদিও বিলয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার পদাঙ্ক, শ্রবণকারী বা শিক্ষাকারীর হৃদয়ে রাখিয়া যায়। শব্দ একই সময়ে সর্ব্বত্রস্থিত, তবে ইহার পুনরুক্তি বা পুনরভিব্যক্তি সম্পাদন করিলে, ফলিতার্থে ইহা সেই শব্দই থাকে, কোন নূতনত্ব বা পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় না। শব্দ যে কেবল বায়ুরই বিবর্ত্ত-বিধায়ক, তাহা নহে; কারণ শ্রবণেন্দ্রিয় অবশ্য স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পবনকে শ্রবণ করে না; কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত আকাশের শব্দগুণকেই গ্রহণ করে বা শ্রবণ করে। এতদ্ব্যতীত অধিকতঃ ও প্রধানতঃ স্বয়ং শ্রুত্যুক্তি-প্রমাণেই শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত।"

উপরোক্ত বাক্য-সমষ্টি জৈমিনি-মীমাংসা-পক্ষীয় বিচার-সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত সার। জৈমিনি-পক্ষ স্বমতানুসৃত যুক্তি-প্রমাণাদির অবতারণা করিয়া, পরে বেদোক্ত শব্দের সমর্থনার্থ বহুবিধভাবে বিচার করিয়াছেন। অতঃপর, আমরা একটি পরবর্ত্তি-সূত্রের বিচার-বিষয়ীভূত সেই "স্ফোট" পদের আলোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইব।

"স্ফোট" অর্থ ফুটিয়া পড়া। পাণিনি "স্ফোট" সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, কিন্তু প্রসঙ্গত "স্ফোটায়ন" নামে এক বৈয়াকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির মতে শব্দই ব্রহ্ম। এই হেতু মাধবাচার্য্য পাণিনিকে দার্শনিকগণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, এবং তাঁহার দার্শনিক মত-বাদকে "বৈয়াকরণবাদ" বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। পাণিনি যদিও স্পষ্টতঃ "স্ফোট" বিষয়ে বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বীগণ সকলেই সমবেতমতে স্ফোটের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শব্দ বা বাক্যের অক্ষরসমূহ দ্বারা কোন অর্থ সিদ্ধ হয় না; উহা উচ্চারিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয়, কারণ উহারা প্রত্যেক বক্তা বা শব্দকর্ত্তার উচ্চারণ বা শব্দকরণ দ্বারাই আত্মসত্তা অভিব্যক্ত করে; যেহেতু উহাদের নিজের কোন ব্যাপ্তি বা সমষ্টি-শক্তির মৌলিকত্ব নাই। উহাদের শেষ অক্ষরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষর-প্রবাহিত অর্থকরী শক্তি বা তাৎপর্য্যবতী অভিব্যক্তি, আমাদের স্মৃতিতে মুদ্রিত বা বুদ্ধিতে প্রতীত হয় না। অতএব স্থূল শব্দ বা বাক্য হইতে স্বতন্ত্র বা শব্দাতীত কোন সূক্ষ্ম-তত্ত্ববিশেষের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। শব্দের সেই সূক্ষ্মতত্ত্বই "স্ফোট"। সমগ্র শব্দটি হইতে একেবারে যে তাৎপর্য্যস্বরূপটি বোধ-বিষয়ীভূত হইয়া বিকাশিত হয়, তাহাই স্ফোট। এই স্ফোট-তত্ত্বই নিত্য, ইহাই পরিবর্ত্তনশীল ও বিকাশশীল বাক্যাক্ষরের অতীত স্বতন্ত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মীমাংসকগণের ন্যায় স্ফোটের ওরূপ গুরুত্ব স্বীকার করেন না। তিনি তৎসমর্থনার্থ "উপবর্ষ" হইতে প্রমাণ

উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষের যুক্তি এইরূপ যে, অক্ষর-সমূহই নিজ সত্তা দ্বারা শব্দ সংগঠন করে ; যেহেতু যদিও উহারা উচ্চারণ বা ধ্বনন মাত্রেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহারা পুনরাগত হইতে পারে। দুইবার "গো" বলিলে, ঐ দুই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উচ্চারিত হইল, এরূপ কেহই মনে করে না। উচ্চারণের পার্থক্য বস্তুতঃ বাগ্‌যন্ত্রগত, আর অক্ষরের প্রত্যভিজ্ঞান তাহার অন্তঃপ্রকৃতিগত। শব্দের বর্ণসমূহ একাধিক হইলেও, অর্থতঃ একমাত্র মানসিক ক্রিয়ারই বিষয়ীভূত হয় ; যথা আমরা 'সারি' বা 'সৈন্য' সংজ্ঞার বস্তুগত বহুত্ব একত্বভাবেই অনুভব করি। যদি এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, "পিক" ও "কপি" শব্দের ন্যায় একই অক্ষর সমূহে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ কেন করে ? উত্তর এই যে, যখন একদল পিপীলিকা সারি বাঁধিয়া সুশৃঙ্খলায় চলে, তখন তদ্দ্বারা একটি শ্রেণী মাত্রের একত্বভাব উপলব্ধ হয় ; তবে যখন তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন বিভিন্নত্ব ও বহুত্ববোধ ঘটে। শঙ্করের মত এই যে, স্ফোটতত্ত্বের কল্পনা বা অবতারণা অনাবশ্যক। তাঁহার মতে শব্দের বর্ণসমূহ এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থবোধের সহিত নিত্য নিবদ্ধ থাকে, এবং একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্নবর্ণ-সমবায়-সঞ্জাত একটি নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য বা অর্থবিশেষ আমাদের বোধ-বিষয়ীভূত করে। অতএব অতিরিক্ত এক স্ফোটতত্ত্বের অনুভূতি অসিদ্ধ। এতাবতা শঙ্কর স্ফোটতত্ত্ববাদ অঙ্গীকার করেন না ; কিন্তু শব্দ ও ব্রহ্মের সমত্ব-প্রতিপাদন-পক্ষে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, এবং নিত্য ও জগন্মূল "শব্দব্রহ্ম" হইতেই যে জাগতিক

অনিত্য পদার্থ—যথা দেব, নর, গো ইত্যাদি উৎপন্ন, তাহাও সিদ্ধান্ত করেন।

যোগদর্শন স্ফোটবাদ স্বীকার করেন, কিন্তু তৎসহযোগীদর্শন সাংখ্য তাহা অস্বীকার করেন। কপিল বলেন,—"যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, এরূপ এক নবোদ্ভাবিত তত্ত্ব স্বীকার করার আবশ্যকতা কি? "বৃক্ষ" হইতে "বন" যেমন অবিভিন্ন, তদ্রূপ শব্দ হইতে অবিভিন্ন এই স্ফোটের সার্থকতা ও প্রামাণিকতা সম্পূর্ণ অনুপপন্ন"। কপিলদেব বেদের নিত্যত্বও অস্বীকার করেন; যেহেতু বেদসমূহ স্বয়ং স্ববাক্যে তাহাদিগের উৎপন্নতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এ স্থলে ইহা অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, এই অনিত্যত্ব-প্রতিপাদন "বেদ" নামধেয় স্থূল গ্রন্থসত্তার প্রতিই প্রযোজ্য; ফলে বেদার্থরূপ নিত্যজ্ঞানতত্ত্বের প্রতি নহে; কারণ "বিদ্" ধাতু-উৎপন্ন 'বেদ'জন্যতা প্রযুক্ত অনিত্য হইলেও, তদ্দ্বারা বেদ্য জ্ঞানতত্ত্ব স্বতএব নিত্য।

ন্যায়দর্শনকার গোতমও শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বেদ-সমূহের যথার্থ নিত্যত্ব তাঁহাদের স্মৃতি, স্বাধ্যায় ও নিয়োগের অক্ষুণ্ণ নিরবচ্ছিন্নতার উপর নির্ভর করে, এবং তাহাদের প্রামাণিকতা সম্যক্ সাধ্যায়-সিদ্ধ আপ্তপুরুষের প্রমাণ-প্রয়োগে নির্ভর করে; অতএব বেদ-সর্ব্বস্ব শব্দের বা শব্দসর্ব্বস্ব বেদের নিত্যত্ব অনুপপন্ন। বৈশেষিকগণও শব্দাত্মক বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ে ন্যায়কার গোতম ঋষির মতের বিশেষ বিভিন্নবাদী নহেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন

যে, বাক্ বা শব্দাত্মক বেদ, বিজ্ঞান বা বিদ্যার ন্যায় নিত্য। শব্দ ভিন্ন জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভবে না। প্রাচীন গ্রীক্‌গণের "Logos" যেমন, ভারতের জ্ঞান বা বেদ তদ্রূপ। কালক্রমে অনেক স্থলে বেদের 'বেদত্ব' কেবল কতিপয় গ্রন্থবিশেষে, এবং ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব-সংহিতা ও তাহাদের "ব্রাহ্মণ" এবং "উপনিষৎ" রূপ স্থূল বিকাশবিশেষেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহেরও সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, মানব-জ্ঞানের সমগ্র শাখা-প্রশাখাই বেদ-বিনির্গত। বস্তুতঃ মানব-জ্ঞানের এরূপ কোন শাখাই কল্পিত হইতে পারে না, হিন্দুগণ যাহার মূল সর্ব্বজ্ঞান-কল্পতরু বেদে প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়াছেন।

ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, শব্দ ও জাতির সম্বন্ধ নিত্য। কিন্তু যদি জগৎ, প্রতি কল্পের অবসানেই অবসান প্রাপ্ত হয়, এবং পুনঃ কল্পারম্ভে পুনঃসৃষ্ট হয়, তবে শব্দ ও জাতির সম্বন্ধগত ব্যবহারিক নিত্যত্বের গতি বাধিত হইল, এবং তদ্ধেতু বিষয়টীও প্রতিবাদবিষয়ীভূত হইল, বলিতে হইবে। বক্ষ্যমাণ সূত্রে উক্ত প্রতিবাদের বিষয়ই এইরূপ আলোচিত হইতেছে যে—যদিও প্রতি মহাপ্রলয়েই এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চের ভৌতিক প্রলীনতা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জগতের সূক্ষ্ম বীজ-শক্তি ব্রহ্মাতত্বগতভাবে অব্যাহত থাকে এবং জগতের পুনঃসৃষ্টিতে সেই মূল কারণ হইতে ইহাও সগুণা ও সক্রিয়া হইয়া পুনঃ প্রকাশ পায়। অন্যথা আমাদিগকে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। জগতের বিভিন্ন সাময়িক বিভিন্ন প্রকারের শক্তি-সত্তা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

নাম ও রূপের মূলতত্ত্বগত একত্ব, শ্রুতি স্মৃতি, উভয় শাস্ত্রেই স্বীকৃত। ঋক্-সংহিতা (১০—১০০।৩) বলেন—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥"

পূর্ব্বকল্প-অনুসারে সৃজিলেন ধাতা—
চন্দ্র-সূর্য্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ তথা।

স্মৃতিও এবম্বিধ উক্তি করিতেছেন, যথা,—

ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তপ্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥"

দিলা অজ, নাম-রূপ বেদ-বিদ্যা-অধিকার।
নিশান্তে প্রসূত পুনঃ ঋষিগণে পুনর্ব্বার॥

ঋতু যেমন ঠিক সর্ব্বস্বাভাবিক সত্ত্ব সহ পুনরাবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন যুগ-প্রলয়ের পর পুনরাবৃত্ত নবযুগে ভৌতিক সত্ত্ব এবং দেবগণের ঠিক পূর্ব্বযুগবৎ নাম রূপ উপাধিসহ পুনরাবৃত্তি ঘটে।

"মধুবিদ্যা" পদের সহজ শাব্দিক অর্থ—মধু সম্বন্ধীয় জ্ঞান। বস্তুতঃ ইহা শ্রুতির ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক এক বিশিষ্ট অংশ। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩—১।১) দেখিতে পাই যে, "সূর্য্যই দেবগণের মধু স্বরূপ এবং আমরাও মধু স্বরূপ সূর্য্যকে ধ্যান করি।" অতএব দেবগণ যদি স্বয়ংই উপাসক-রূপে স্বীকৃত হন, তবে কিরূপে এই আদিত্যও স্বয়ং দেব হইয়া আপনাকে আপনি ধ্যান করিবেন? এতাবতা জৈমিনির সিদ্ধান্ত এই যে, দেবগণ বেদবিদ্যাধিকারী নহেন।

জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আদিত্যবৎ আকাশ-মণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া জগৎ আলোকিত করেন। এই আদিত্য একটি প্রধান দেব বলিয়া পরিচিত। ফলে হৃৎ-ফুস্ফুষাদি-সমন্বিত কোন জৈবিক শারীর-সত্তা বা বুদ্ধিমত্তা জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সম্ভবে না; অতএব তাহাদের ব্রহ্ম-জ্ঞানাধিকার অনুপপন্ন। তারপর, যদিও মন্ত্র ও পুরাণ সকল দেবগণের ব্যক্তিত্ব ও মূর্ত্তসত্ত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু ধর্ম্মোপদেশাদিবৎ মন্ত্র ও পুরাণাদি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদের প্রতি নিশ্চয় নির্ভর করা যাইতে পারে না।

বাদরায়ণ বলেন, দেবগণ জ্ঞানের অন্যান্য অবান্তর-বিষয়াধিকারী না হইলেও, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে পারেন। এমন কি, মনুষ্য মধ্যেও সকল মনুষ্য সকল বিষয়ে সমাধিকারী হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কদাপি রাজসূয়যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন না। ফলে দেবগণের উক্ত অধিকার-প্রতিপাদক স্পষ্ট শ্রুত্যুক্তি রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন, ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন ইত্যাদি। এতাবতা পূর্ব্ব-বর্ত্তী সূত্রের আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদিও দেবগণ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের এরূপ বিশেষ দৈব আত্মসত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও অব্যাহত শক্তি-সম্পন্নতা আছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা যে কোন তত্ত্বমূলক রূপধারণে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

শূদ্রের বেদাধিকার-বিচার ।

৩৪ ।　शुगस्य तदनादर-श्रवणात्तदाद्रवणात् सूच्यते हि ।

৩৫ ।　क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात् ।

৩৬ ।　संस्कारपरामर्शात् तदभावाभिलापाच्च ।

৩৭ ।　तदभावनिर्द्धारणे च प्रवृत्तेः ।

৩৮ ।　श्रवणाध्ययनार्थ-प्रतिषेधात् स्मृतेश्च ।

৩৯ ।　कम्पनात् ।

৪০ ।　ज्योतिर्दर्शनात् ।

৪১ ।　आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् ।

৪২ ।　सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन ।

৪৩ ।　पत्यादि शब्देभ्यः ।

৩৪ ।　নিজের অপ্রশংসা-শ্রবণে দুঃখকর্ত্তৃক প্রচালিত হওয়াতেই "জনশ্রুতি' 'রৈক্ক' কর্ত্তৃক "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শূদ্রজাতীয়ত্ব-হেতুতে নহে ।

৩৫ ।　চৈত্ররথের সহিত একত্রে উল্লিখিত হওয়াতেই জনশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অনুমিত হইয়াছে ।

৩৬ ।　উচ্চ ত্রিবর্ণের উপনয়ন-সংস্কার থাকায় এবং শূদ্রের তাহা না থাকায়, শূদ্রের বেদে অনধিকার বিহিত হইয়াছে ।

৩৭ ।　সত্যকাম জাবাল শূদ্র নহে, বুঝিয়াই গৌতম তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন ; এই জন্যও শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে ।

৩৮। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারাও শূদ্রের বেদ-শ্রবণ—অধ্যয়ন বারিত হওয়াতে, শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৯। প্রাণই ব্রহ্ম, যেহেতু বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই ইহাতে কম্পিত হয়।

৪০। ব্রহ্মই জ্যোতিঃস্বরূপ, শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হওয়াতে, "জ্যোতি" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৪১। আকাশ নাম-রূপ উপাধির অতীত, উক্ত হওয়ায়, "আকাশ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৪২। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ-বোধ হইলেও তত্ত্বতঃ উভয়ের একত্ব উক্ত হওয়ায়, জীবাত্মা না বুঝাইয়া পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

৪৩। "পতি" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হেতু পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

৩৪ হইতে ৩৮ পর্য্যন্ত একটী অধিকরণ, ৩৯ সূত্র এক অধিকরণ, ৪০ সূত্র আর এক অধিকরণ, ৪১ সূত্র এক অধিকরণ, ৪২ ও ৪৩ সূত্র অপর এক অধিকরণ।

---

৩৪ হইতে ৩৮ সূত্র পর্য্যন্তের বিষয়, শূদ্র যে বেদাধ্যয়নের অনধিকারী, তাহা প্রমাণ করা। ফলে এ প্রামাণিকতা "শূদ্র" পদের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধের প্রতিই নির্ভর করে। যাহারা আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা মানসিক শিক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শে উপনীত হইতে পারে নাই, তাহারাই যদি প্রকৃতপক্ষে "শূদ্র" পদবাচ্য বলিয়া বিবেচিত

হয়, তবে সেরূপ শূদ্র-লক্ষণ অপর উচ্চতর ত্রিবর্ণের মধ্যেও বিস্তর লক্ষিত হইবে। যদি কেবল গুণানুযায়ী জাতিবিচার না ধরিয়া, জন্মানুযায়ী জাতি-বিচারই ধরিতে হয়, তবে প্রাচীন কালে অনেক অনার্য্য জাতীয় ব্যক্তিও যে উচ্চতর আর্য্য-বর্ণত্রয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত-প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইবে। পুরাকালে যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ হইয়াছিল, এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অবনয়ন ও স্বজাতীয় উন্নয়নে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ব্রাহ্মণ-বীর পরশু-রামাবতারের অভ্যুদয়। তিনি অনার্য্য জাতীয়কেও গুণোন্নয়ন মতে ব্রাহ্মণত্ব দিয়া, স্বীয় সম্প্রদায়ের সম্পোষণ ও বলবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এবম্বিধ উদাহরণ ভূরি পরিমাণে প্রদর্শিত হইতে পারে।

বেদ-স্বাধ্যায়ের সদুপযোগিনী বিদ্যাশিক্ষার অভাবই যদি শূদ্রত্ব হয়, তবে তাহা সর্ব্ববর্ণের প্রতিই খাটে, এবং তাহাহইলে শূদ্রের বেদাধিকারের নিষেধবিধির কোন সার্থকতা থাকে না। মূর্খেরা ত বেদের কাছে ঘেঁসিতেই পারে না, ঘেঁসিবেও না। তবে আর কাহাদিগকে নিবারণ করিতে উক্ত নিষেধ-বিধির প্রয়োজন হইবে? প্রথমে আমরা দেখিব যে, উক্ত বিষয়ে বাস্তবিক সূত্রসমূহের তাৎপর্য্য কি, এবং শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বাভাবিকী সদুদার-নীতি সত্বেও, উক্ত সূত্রাবলীর ভাষ্যে উক্ত বিষয়ে তাৎকালিক সমাজ ও কালধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় কিরূপ সংকীর্ণতায় পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।

২৫শ সূত্রের প্রতিপাদ্য এইরূপ যে, মনুষ্যগণ বেদ-স্বাধ্যায়ের

অধিকারী; কিন্তু এই 'মনুষ্য' পদে উপযুক্ত শিক্ষাধিকারসম্পন্ন মনুষ্যকেই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই দ্বিজ ত্রিবর্ণের মনুষ্যকেই বুঝাইতেছে। "মীমাংসাদর্শন" বলেন যে, দ্বিজাতির উপনয়নসংস্কারই বেদ-স্বাধ্যায়ে প্রবৃত্ত হইবার অবশ্য-কর্ত্তব্য প্রাথমিক অনুষ্ঠানবিশেষ; উহা দ্বিজ ত্রিবর্ণের জন্যই; উহা শূদ্রজাতির জন্য বিহিত হয় নাই।

৩৪ হইতে ৩৭ সূত্র পর্য্যন্ত, এই পঞ্চ সূত্রের প্রতিজ্ঞাও ঐ একই বিষয়ের প্রতিপাদক, এবং শূদ্রের বেদাধিকার-প্রতিপাদনের অনুকূল তর্কসমূহের খণ্ডনই তাহার বিষয়। উক্ত খণ্ডনসমূহ বক্ষ্যমাণ বেদান্তসূত্রে যে ভাবে পরিব্যক্ত বা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, সূত্রগুলির সংগঠন-সময়েও শূদ্রগণের বেদাধিকারের অনুকূল অভিমত সূত্রকারের স্বশ্রেণীস্থ অনেকের মধ্যেও বর্ত্তমান ছিল; নচেৎ উক্ত খণ্ডনসমূহের কোনই কার্য্যকারিতা থাকে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়োক্ত "জনশ্রুতি ও রৈক্ক" আখ্যান দ্বারা ইহাই প্রমাণিত করার চেষ্টা হইয়াছে যে, "শূদ্র" পদের ব্যুৎপত্ত্যর্থ যাহাই হউক্, উক্ত পদে পরিচিত জাতীয়ের বেদে অনধিকার; কিন্তু জনশ্রুতি ও তৎপরবর্ত্তী সত্যকাম জাবালের আখ্যানে শূদ্র যে বেদে অনধিকারী নয়, তাহারই বরং অনুকূলতা পাওয়া যায়। কিন্তু সূত্রভাষ্যকার স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যায় তাহার বিপরীত প্রমাণেরই প্রযত্ন করিয়াছেন।

আখ্যানটি এইরূপ—জনশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতি দয়ালু, পরোপকারপরায়ণ ও আতিথেয় ছিলেন। তাঁহার

পুরী হইতে কেহই অভুক্ত যাইতে পারিত না। একদা একদল রাজহংস তাঁহার রাজপুরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তীটি রাজা জনশ্রুতির প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী রাজহংসটি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, "রাজা জনশ্রুতির যশ রৈক্কের যশের সহিত কোন ক্রমেই তুলনীয় নহে।" পরদিন প্রাতঃকালে যখন প্রাচ্য রীত্যনুসারে ঐ রাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়ে বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছিলেন ; তখন সেই রাজহংসের বাক্য রাজার বিশেষ স্মরণ থাকায়, তিনি রৈক্কের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন ; এবং তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া, ছয় শত পালিত গবাদি, একগাছি কণ্ঠহার ও যুগল-বড়ব-বাহিত এক রথ উপহার স্বরূপ লইয়া, রৈক্ক-পূজিত দেবতার সাধনশিক্ষা-লাভের প্রার্থনায় রৈক্ক-সন্নিধানে সমাগত হইলেন। তখন রৈক্ক যেন প্রায় অর্থলোভী বর্ত্তমান পুরোহিত দলের প্রাচীন আদর্শ স্বরূপে বলিয়া উঠিলেন—"হে শূদ্র ! এই সমস্ত পশ্বাদি, কণ্ঠহার ও রথ তোমারই থাকুক্।" জনশ্রুতি ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইলেন না ; পরন্তু পুনরায় সহস্র পশু, কণ্ঠহার, বড়বযুগ-বাহিত রথ এবং অধিকন্তু তাঁহার এক রূপসী যুবতী কন্যা উপহার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন এই তথাকথিত ঋষি রৈক্ক, পশু ও স্বর্ণাদির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেও, এই মোহিনী কন্যার মোহ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া কহিলেন, "হে শূদ্র! তুমি কি ইহাকেও আমার জন্য আনিয়াছ ? যদি সত্য হয়, তবে এই কন্যাই তোমার সহিত আমার আলাপের হেতুভূত হইবে।" যাহাহউক্, ইহাতেই তিনি

জনশ্রুতিকে সসন্তোষে "সম্বর্গবিদ্যা" শিক্ষা দিলেন। জগতের আদি তত্ত্বের জ্ঞানই সম্বর্গবিদ্যা। তাহার মর্ম্ম এই যে, অগ্নি, সূর্য্য এবং জলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বায়ুতত্ত্বগত এবং বায়ুর মূল সত্তা ব্যোমই জড় জগতের আদি মূল সত্তা। জীবপক্ষে জীবনই জৈবিক তত্ত্বের মূলতত্ত্ব। বাক্য, চিন্তা, সংকল্প, মন—এ সমস্তই মূলজীবতত্ত্বগত; তাহাতেই উদ্ভূত, তাহাতেই বিলীন। বায়ু এবং প্রাণ যুগল মূল-তত্ত্বোদ্ভূত যুগলতত্ত্ব ইত্যাদি। যাহাহউক, এই প্রকার সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ জনশ্রুতির প্রদত্ত মহার্হ উপহার নিচয়ের সমযোগ্য হইয়াছিল কি না, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। যদি তিনি তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন বিতর্ক নাই; কিন্তু অধ্যাপক মোক্ষমূলর অতি সুযোগ্যভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, রৈক্কের প্রদত্ত শিক্ষা জনশ্রুতি-প্রদত্ত বৃহৎ উপহারের যোগ্য হয় নাই। সে যাহাহউক, বিচার্য্য বিষয় এই যে, জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র, কিম্বা কেবল রৈক্ক কর্ত্তৃক অবজ্ঞার সহিত "শূদ্র" আখ্যায় অভিহিত। জন-শ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র, অথবা ক্ষত্রিয়, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছুই স্পষ্টীকৃত হয় নাই। ৩৫ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি ক্ষত্রিয়ই হই-বেন, নচেৎ সেই একই অধ্যায়ে রৈক্কপ্রদত্ত সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ-দান-প্রসঙ্গে জনশ্রুতির সহিত ক্ষত্রিয় চৈত্ররথের নামোল্লেখ হইবে কেন? কারণ, একই বিষয়ে পরস্পর সমধর্ম্মী বস্তুদ্বয়েরই একত্রে উল্লেখ হইয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণে, মহাভারতে, এমন কি, বেদেও একই বিষয়ে আর্য্য ও অনার্য্যের বহুস্থলে একত্রে উল্লেখ দৃষ্ট হয়; পরন্তু তদ্দারা পরস্পরের জাতিবিপর্য্যয়-সংঘটন অপ্রমাণিত।

অতঃপর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, জনশ্রুতির বন্দী, দূত, রথ, ধনসম্পদ্ ইত্যাদি রাজন্য-জন-সুলভ যত কিছু ছিল, তদ্দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয়ই প্রতিপন্ন হইতে পারেন। এ যুক্তিও অদৃঢ়; কারণ পুরা-কালে ভারতবর্ষে অনেক অনার্য্য রাজা ছিলেন এবং তাঁহারা তাৎকালিক ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত বন্ধুতাদি বিবিধ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ছিলেন। আমাদের জগদ্বিখ্যাত রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন কালে জনৈক অনার্য্য রাজা গুহকের ভবনে কি ভাবে উপনীত ও তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। নীচ ব্যক্তি উচ্চ ব্যক্তির সমাগমে যেরূপ তাঁহাকে অভিভাবক তুল্য গুরু-গৌরব-দানে সমাদরে সসম্ভ্রম সম্বর্দ্ধনা করে, গুহক ঠিক্ সে ভাবে রাম-চন্দ্রের অভ্যর্থনা করেন নাই; পরন্তু পরমপ্রেমাস্পদ প্রাণপ্রিয় বন্ধু জ্ঞানেই হৃদয়াসনে বসাইয়াছিলেন। অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত যাত্রার আসরে বা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে গুহককে অতি নীচ চণ্ডালরূপে ও রামচন্দ্রকে সমুচ্চ ক্ষত্রিয়রাজ রূপে প্রদর্শিত করা হয়। এতদ্দেশে এবম্বিধ অভিনয় সমাচার সকলেই দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ রাম-গুহক-মিলন পরস্পর সমযোগ্য বন্ধুভাবেরই মিলন; আর্যঅনার্য্যের গুরুত্ব-লঘুত্বগত উচ্চ-নীচ-মিলন নহে।

অপর, ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, জনশ্রুতি শূদ্র হইলে, কদাচ ব্রাহ্মণ রৈক্ক তাহার কন্যাকে গ্রহণ করিতেন না। এ যুক্তিরই বা দৃঢ়তা কোথায়? আর্য্য-অনার্য্যের বৈবাহিক সম্বন্ধের উদাহরণ ভারতীয় পুরাণেতিহাসে বিস্তর বর্ত্তমান। অনার্য্য দাসরাজের কন্যা সত্যবতীকে ঋষিরাজ পরাশর বিবাহ করিলেন এবং তাঁহাদেরই

সুবিখ্যাত পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মাতৃবর্ণানুসারে বেদব্যাসের অনার্য্যত্ব থাকিলেও, তিনি তৎসাময়িক ঋষিবর্গের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়া অসংখ্য শাস্ত্রপুরাণাদি প্রণয়ন করেন এবং বেদের "ব্যাস" অর্থাৎ বিভাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ "বেদব্যাস" উপাধি লাভ করেন। জরৎকারু ঋষি অনার্য্য বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করেন, এবং এই দম্পতীর পুত্র আস্তিকই আর্য্য অনার্য্যের বিখ্যাত বিবাদ-বিগ্রহে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন করেন। ভারতীয় পুরাণ-শাস্ত্রের বিরাট্ ভাণ্ডারে এবম্বিধ ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইতে পারে।

সূত্রকার এবং টীকাকারের মত এই যে, জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র নহেন; কিন্তু হংস-মুখে আপন অপেক্ষা রৈক্কের প্রশংসাবাদ শুনিয়া, তিনি যে তামসধর্ম্মরূপ দুঃখে বিচলিতচিত্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার "শূদ্র" অভিধানের হেতু। "শুচা দ্রবতীতি শূদ্রঃ" অর্থাৎ যে শোকের দ্বারা প্রচালিত, সেই শূদ্র; এই ব্যুৎপত্ত্যর্থ অনুসারেই জনশ্রুতির পূর্ব্বোক্ত দুঃখ-দ্রবিতচিত্ততা জন্যই তাঁহার শূদ্র আখ্যা; ফলিতার্থে তিনি প্রকৃত শূদ্রজাতীয় নহেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন—

"**কথং পুনঃ শূদ্র শব্দেন শুগুৎপন্না সূচ্যতে ইতি উচ্যতে তদা-দ্রবণাচ্ছুচমভিদুদ্রাব শুচা বাভিদুদ্রুবে শুচা বা রৈক্কমভিদু-দ্রাবেতি শূদ্রাবয়বার্থ সম্ভবাৎ রূঢ়ার্থস্য চাসম্ভবাৎ।**"

এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, জনশ্রুতির অন্তরোদ্ভূত শোক তৎপ্রতি প্রযুক্ত "শূদ্র" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতে পারে কি না? বাস্তবিক 'শূদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা শোক সূচিত হয়, সন্দেহ

নাই। জনশ্রুতি সেই শোকের দ্বারা বিচলিত ও অভিভূত হইয়াছিলেন। শোক তাঁহাতে প্রাদুর্ভূত বা তিনি শোকে সমাহিত হইয়াছিলেন অথবা তাঁহার শোকবেগ তাঁহাকে রৈক্ক-সমীপগত করিয়াছিল। আমাদের মতে শঙ্করের শূদ্রত্বসূচিকা এই ব্যাখ্যা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। আলোচ্য-স্থলের শূদ্র-সম্ভাষণ অনেকটা আলঙ্কারিক ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। ফলে বর্ত্তমান বিতর্কে শঙ্করের যুক্তির সার এই যে, জনশ্রুতি রাজহংস-সংবাদে বাস্তবিক বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কথিত রৈক্ক ঋষি তাহা যোগবলে জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে "শূদ্র" সম্বোধন করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যায় যিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, তিনি হউন; কিন্তু আমাদের মনে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এতদ্দ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার-প্রতিপাদনের সম্ভাবনা নিবারণোদ্দেশেই ভাষ্যকার ঐ প্রকার অসরল ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যতঃ সুযোগ্যাধিকারী শূদ্রগণ কদাচ বেদ-স্বধ্যায়ে বঞ্চিত হন নাই। যজুর্ব্বেদে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—

"**যথেমাং বাচং কল্যাণীম্ বদানি ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায়।**" অর্থাৎ—

এ কল্যাণী বেদবাণী
উচ্চারিয়া বলি আমি—
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণে,
শূদ্র আর বৈশ্য জনে।

স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যাই

করিয়াছেন। ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যজাতিই শূদ্র হউক, আর মূল আর্য্যজাতিরই কোন অধস্তন শাখাবিশেষই শূদ্র হউক, ফলে শূদ্রের বেদাধিকার যে বৈদিক সময়ে বারিত হইয়াছিলনা, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এমন কি, বেদাধিকারে শূদ্রবারণ-বিধির প্রবর্ত্তনা হইলেও, তাহা কার্যাতঃ সেরূপ ছিলনা। তখনও স্বীয় গুণে সুযোগ্যাধিকারী শূদ্র বেদ-স্বাধ্যায়ে সমর্থ হইতেন, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সত্যকাম-জাবাল-সংবাদে সুপ্রতিপন্ন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার এই শূদ্র-বেদ-বারণবিধি বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন———"ইহা সাধারণতঃ অনুমিত হয় যে, ভারতীয় চতুর্থ জাতি শূদ্র, প্রাচীন অনার্য্য অধিবাসী বলিয়া জাত্যংশে বস্তুতঃ তাহাদের বিজেতা আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন, এবং এরূপও হইতে পারে যে, (কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই) প্রকৃত আর্য্যসন্তান হইয়াও, কার্য্যদোষে গুণাবনতির ফলে তাহারা বিশুদ্ধ আর্য্যাধিকার-বিচ্যুত ও শূদ্রত্ব তুল্য সামাজিক নীচত্ব অথবা তদধিক অতিনীচত্ব বা পাতিত্যপ্রাপ্ত। বাদরায়ণ বলেন, "যাহারা দারিদ্র্য ও অন্যান্য বিবিধ দোষদুষ্ট অবস্থায় পড়িয়া দ্বিজ ত্রিবর্ণের নিম্নে শূদ্রস্থানীয় হইয়াছে, তাহারা বেদান্ত-বিদ্যায় বারিত হয় নাই।" অনেক সময়ে অনেক বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মনে প্রকৃত শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়ে বিতর্ক উঠিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাঁহারা সেই নিষেধ-বিধিতেই লাগিয়া রহিয়াছেন। ফলে উপনিষদের বিবিধ বাক্যপ্রমাণে ইহা অনুমিত হয় যে, অন্ততঃ পুরাকালে উক্ত নিষেধ-বিধির বিশেষ দৃঢ়তা ছিল না। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্র আমরা অবশ্য

বিস্মৃত হইবনা, যাহাতে স্পষ্টই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অন্যান্য জাতির ন্যায় ব্রহ্মা হইতে শূদ্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে। অপর, ইহা অবশ্য অপ্রকাশিত নহে যে, সবিদ্য শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের সহিত সমভাষা-ভাষীই ছিলেন। উপনিষদে অন্ততঃ জনশ্রুতি ও সত্যকাম, এই দুইজন সম্বন্ধে শূদ্রের বেদান্তাধিকার স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

এক্ষণে ৩৫ সূত্র ও তাহার শঙ্করভাষ্য আলোচনায় এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, শূদ্র শব্দের সাধারণ নির্দ্দিষ্ট অর্থ জনশ্রুতি-বিষয়ক উদাহরণে প্রচলিত ও প্রবল থাকার কোন সুযুক্ত কারণ দৃষ্ট হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐরূপ কোন শূদ্রত্বসূচক অর্থ পরিগৃহীত বা প্রতিপন্ন হয় নাই। যদি শূদ্র শব্দের প্রচলিত অর্থ স্বীকার না করিয়া, ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থই গ্রহণ করিতে হয়, তবে যাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা যে কোন কারণে শোকাভিভূত হওয়াতেই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ কেন না বলা হয়? "শূদ্র" শব্দে এমন কিছুই নাই, যাহাতে তদভিধানিগণ বেদাধিকার-বঞ্চিত হইতে পারে। আর বেদেও তাহার সমর্থক কোন বচন-প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। শঙ্করাচার্য্য বলেন, জনশ্রুতির শূদ্রাভিধান প্রচলিত অর্থানুসারে পরিগৃহীত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবই বা কেন? বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থানুসারে জনশ্রুতি কোন অনার্য্যবংশ-সম্ভূত শূদ্র রাজা হওয়া কি অসম্ভব? আর তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভের জন্য উপযুক্ত গুরু-প্রণামী সহ রৈক্কের শিষ্যত্বপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু রৈক্ক আধুনিক লুব্ধ ও কোপন গুরু-পুরোহিতের ন্যায় প্রথমে তাঁহাকে

প্রত্যাখ্যান করিয়াও, অবশেষে সেই শূদ্ররাজের সুন্দরী কন্যার সুন্দর মুখের মোহে পড়িয়া, পরে তাঁহাকে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন, ইহাই বা অসম্ভব কি?

অধুনা ভারতীয় অনেক জাতিই "শূদ্র" বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, যাঁহাদিগকে আমরা বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহারা তদিতর একটি ভিন্ন জাতি, তাহা হইলেই বা সেই শূদ্রজাতীয়ত্ব কোনরূপ লজ্জার বিষয় হইতে পারে কিরূপে? ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বপ্রধান সম্রাট্ অশোক, শূদ্র চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। যে বাসুকির সহিত বিখ্যাত আর্য্যরাজগণের বিবিধ বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তিনি শূদ্র ছিলেন। শূদ্র অনার্য্য হইলেও, বেদে তাহাদিগকে শক্তিশালী জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের সুন্দর নগর-সমূহ, সুবিস্তীর্ণ সুখদ উদ্যান সমূহ, সুদৃশ্য অট্টালিকা সমূহ এবং পাষাণ বা লৌহময় দুর্গসমূহের বর্ণনা বেদে দৃষ্ট হয়। ফলে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লইয়া যে আর্য্য জাতির সহিত তাহাদের সমর-সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাঁহাদের অপেক্ষা সভ্যতায় তাহারা অত্যধিক হীন বলিয়া বোধ হয় না। যদি বাস্তবিক বর্ত্তমান শূদ্রগণ তাহাদেরই উত্তরপুরুষ হন, তবে তাহাতেও কিছুমাত্র লজ্জা বা হীনতার কারণ নাই। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বীর ভীম ও অর্জ্জুনের অনার্য্য-বংশীয়া সহধর্ম্মিণী ছিল এবং তাঁহাদের প্রপিতামহী সত্যবতী স্বয়ং অনার্য্য রাজার কন্যা ছিলেন। আমাদের জগদ্বিখ্যাত রামচন্দ্র বিভিন্ন অনার্য্য জাতির সামরিক সহায়তা গ্রহণ করিয়াই সেই অশেষশক্তি-

সম্পৎসম্পন্ন অনার্য্য রাজা রাবণকে সবংশে সংহার করিয়াছিলেন। ফলে এই আর্য্য-অনার্য্য, দেব-অসুর বা নর-রাক্ষস প্রভৃতি জাতি সর্ব্বাদিমূলে একই সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত; সুতরাং রাবণাদির জাতীয়তাও তদুদ্ভুত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বিভিন্নতা বা বৈপরীত্য, ক্রমে উত্তর-পুরুষ-পরম্পরায় বিবিধ কারণে সংঘটিত হইয়াছে। ফলতঃ সুপ্রাচীন সময়ে আর্য্য-অনার্য্যের ভেদ অতি সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর। যদি পুরাকালে তাই হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে উক্ত ভেদের বর্ত্তমান কার্য্যকারিতা কিছুই নাই, এবং শত শত শতাব্দী হইতে বিবিধ কারণে শত শত জাতির মিশ্রিত শোণিত আ'জ ভারতীয় হিন্দুধমনীতে প্রবহমান। জাঠ, রাজপুত, গুর্খা, এখন সকলেই হিন্দু। রাজপুতেরা রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষত্ব দাবী করেন; কিন্তু ইতিহাস দ্বারা কি ইহা ঠিক্ প্রমাণিত হয়? যাহাহউক্, রাজপুত যদি এক্ষণে নিজ জাতিতে সূর্য্যবংশীয় শোণিতের অবিকৃত অস্তিত্ব ঠিক প্রমাণ করিতে না পারেন, তবে কি তিনি হেয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন? বাস্তবিক ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, এই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিস্তারের যুগে মানবের বিবিধ-বিষয়িণী উদারতা বিবিধ প্রকারে বর্দ্ধিতা হইলেও, জাতীয়তার অধিকার-অনধিকারের ঘোঁট বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না; বরং যখন ভারতীয় জন-সমাজ আপনাদের জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন আর প্রায় কিছুরই সংবাদ রাখিত না, তখন যেন ইহার এত বাহ্যিক বাঁধাবাঁধি বা বাড়াবাড়ি ছিল না।

যাহাহউক্, আমরা আবার শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যালোচনায়

প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। ৩৮ সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলেন যে, স্মৃতি শূদ্রের বেদাধিকার বারণ করিতেছেন, যথা—"**যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃত-সংস্কারবশাৎ বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিস্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবন্ধুম্ জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি।**" অর্থাৎ বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির ন্যায় যে সমস্ত শূদ্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারসিদ্ধ, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে স্বতএব অবারিত; কারণ ঐকান্তিক জ্ঞানের ফল জন্ম-জন্মান্তর-নির্ব্বিশেষে অবিধ্বংসী। স্মৃতি, চতুর্ব্বর্ণকেই পুরাণেতিহাস অধ্যয়নে তুল্যাধিকার প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বেদে শূদ্রের অধিকার বিধান করেন নাই। "শূদ্র" শব্দের যেরূপ অর্থই গৃহীত হউক্ না কেন, মন্বাদি স্মৃতি যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শূদ্রের ইতিহাস-পুরাণাদিতে অধিকার অব্যাহত রাখিয়াছেন। ফলে ইতিহাস-পুরাণই বা কি? মনে করুন, মহাভারত এক মহা ইতিহাস এবং "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সেই মহাভারতেরই অন্তর্গত; স্নুতরাং শূদ্রের গীতাধ্যয়নে অনধিকার নাই। এই গীতা উপনিষৎসমূহের সারসংগ্রহ স্বরূপ। কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি বিস্তর উপনিষদের বিস্তর বচন প্রায় অবিকল গীতায় উদ্ধৃত। গীতা-মাহাত্ম্যে ত স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে,—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

অর্থাৎ—

সর্ব্বোপনিষদ্ গাভী, দোহাল গোপাল-সুত।
পার্থ বৎস, সুধী ভোক্তা, দুগ্ধ মহাগীতামৃত॥

ফলে সাক্ষাৎ ঔপনিষদীশ্রুতিসমূহ-সমন্বিত গীতাশাস্ত্র তবে কিরূপে শ্রুতি-অনধিকারী শূদ্রাদির পাঠ্য হইতে পারে? তাহা হইলে বেদান্তের সূত্র ও টীকাকারের মতে গীতাধ্যয়নও শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহাত হইতেছে না। গীতাতে শূদ্রাদি স্বচ্ছন্দে শ্রুতি আবৃত্তি করিতেছেন! এখন মনে করুন, গোলাপকে অন্য নামে ডাকিলে কি তাহার গোলাপত্ব নষ্ট হয়? যাহা কার্য্যতঃ সংঘটন, তাহা শত শাস্ত্রবচনেও ব্যাহত হয় না। "বচন-শতেন বস্তুনোঽন্যথা কর্ত্তুং ন শক্যতে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা যে শ্রুতিসারসংগ্রহ, তাহা পণ্ডিতগণের সুবিজ্ঞাত; অথচ এই গীতা প্রতিদিন স্ত্রী-শূদ্রাদির পাঠার্থ অনুমোদিত বা ব্যবস্থিত রহিয়াছে। বস্তু একই, কেবল "বেদ-বেদান্ত" না বলিয়া "পুরাণ ইতিহাস" বলা হইতেছে মাত্র! শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণেও কতিপয় ঔপনিষদী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং তাহা অবাধে শূদ্রাদির দ্বারা অধীত হইতেছে। কঠশ্রুতির নচিকেতোপাখ্যান ও তাহার কতিপয় শ্লোক অগ্নিপুরাণে উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়, সেই অগ্নিপুরাণ শূদ্রাদির পাঠ্য; কিন্তু সেই মূল কঠশ্রুতিই মাত্র শূদ্রের অধিকারাতীত! ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত বিধান আর কি হইতে পারে? ফলিতার্থে ইহা সাধারণ-জ্ঞান-বিস্তারের প্রতিরোধী সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার কুফল মাত্র।

কতকগুলি লোক এই জ্ঞান-বিস্তার-বিরোধিনী সঙ্কীর্ণা নীতির চিরপক্ষপাতী, আবার কতকগুলি উদারনৈতিক লোক তাহারই বিরুদ্ধবাদী। একটি সমগ্র জাতিকে জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সুপবিত্র শিক্ষায় চিরবঞ্চিত রাখা কদাচ তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাঁহারা কদাচ এই বিদ্বেষ-বিদূষিত স্বার্থ-সঙ্কুচিত সাংঘাতিক মতের পরিপোষক নহেন।

ভারতবর্ষে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ বেদান্তবিদ্যা হইতে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাৎকালিক গর্ব্বিত বিপ্রপুত্রও করযোড়ে ক্ষত্রিয়ের নিকট বেদ-বিদ্যালাভার্থে প্রপন্ন হইতেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ে ৩য় পরিচ্ছদে যে শ্বেতকেতু আরুণি এবং পাঞ্চালরাজ প্রবাহণের আখ্যান বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্ম-বিদ্যালোচনার কতদূর অধিকার ছিল, তাহা জানা যায়। আখ্যানটি এইরূপ, ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু, একদা রাজন্য প্রবাহণের রাজসভায় উপনীত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বালক তদুত্তরদানে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ-বালক শ্বেতকেতু, স্বীয় পিতৃসন্নিধানে আসিয়া, অভিমান-ব্যথিতভাবে রাজার কৃত প্রশ্ন ও উত্তরদানে স্বকীয় অক্ষমতা নিবেদন করিলেন। তাহাতে পিতা বলিলেন, তিনিও তৎসমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তৎপর পিতা উক্ত রাজসমীপে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "আমার ভাণ্ডারের ঐহিক দ্রব্যরাশির মধ্যে আপনি

যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, তাহাই প্রার্থনা করুন।” ব্রাহ্মণ কহিলেন, “ও সব অনিত্য ধন আপনাতেই থাকুক, আমি উহার প্রার্থী নহি। হে রাজন্! আমার পুত্রকে আপনি কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহারই ব্যাখ্যা করুন।” রাজা কহিলেন, “কোন ব্রাহ্মণই ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না; পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই এই বিষয়ে শিক্ষাদানে সমর্থ।”

“स ह कृच्छ्री बभूव तं ह चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार तं होवाच यथा मा त्वं गौतमाऽवदो यथेयन्न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्मात् सर्व्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच।”

শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ব্রাহ্মণেরা তৎকালে উক্ত বিষয়ের কিছুই জানিতেন না; ক্ষত্রিয়েরাই উহার একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন এবং উহা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ক্ষত্রিয়-জাতিতেই নিবদ্ধ ছিল। এতাবতা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিল। কতিপয় ক্ষত্রিয় উক্ত বিদ্যা-অধিকারে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন; তবে কেবল প্রবাহণের ন্যায় উদারচেতা রাজন্য-গণই তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে কোন পার্থক্য বিধান করেন নাই।

তৎপর ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১২শ পরিচ্ছেদে ঐরূপ এক আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্মণ “আত্মা কি ও ব্রহ্ম কি?” এই তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং তাঁহারা নিজেরা কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া, উদ্দালক সমীপে

গমন করিলেন। উদ্দালকও তাঁহাদের জিজ্ঞাসার প্রকৃত উত্তর-দানে অক্ষম হইলেন; সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজা অশ্বপতির সন্নিধানে উপনীত হইলেন; রাজা অশ্বপতি তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পরদিবস রাজা তাঁহাদিগকে ধনদানে উদ্যত হইলে, তাঁহারা তৎপ্রতিগ্রহে অসম্মত হইলেন। ইহাতে রাজা ভাবিলেন যে, হয়ত তাঁহার রাজ্যপালন সম্বন্ধীয় কোন ত্রুটি বা দোষের প্রতীকারার্থে তাঁহারা আসিয়াছেন; এই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে ত কোন দস্যু তস্কর নাই, কোন কৃপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, মূর্খ নাই, ব্যভিচারী নাই, ব্যভিচারিণী নাই" ইত্যাদি। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা সে সব কোন কারণেই আসেন নাই; তাঁহারা ধনের প্রার্থীও নহেন, পরন্তু তাঁহারা পরম-ধন ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের প্রার্থী। এতচ্ছ্রবণে রাজা বলিলেন, "আমি আগামী কল্য এ বিষয়ে আপনাদিগকে বলিব।" তদনুসারে তৎপরদিবস তাঁহারা শিক্ষা-লাভার্থে গুরুসমীপার্থী শিষ্যবৎ হোম-সমিধাদি-সহকারে রাজা অশ্বপতির নিকট আগমন করিলেন এবং অশ্বপতিও যজ্ঞোপবীত দ্বারা উপনয়ন বিধান না করিয়াই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

"तान् होवाचाश्वपतिर्वै भगवन्तोऽयं कैकेयः सम्प्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तं हन्ताभ्यागच्छामेति तं हाभ्याजग्मुः ॥ तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयाञ्चकार स ह प्रातः सञ्जिहान उवाच—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো
নানাহিতাগ্নি নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ।

যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি ভবন্তু ভগবন্ত ইতি। তে হোচুর্য্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেতাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি তান্ হোবাচ প্রাতর্ব্বঃ প্রতিবক্তাঽস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ।"

এই সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয় সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা-লাভার্থ উপস্থিত হইতেন; কিন্তু অধুনা কেবল শূদ্র নহে, পরন্তু পুরাণাদি সহ বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকা সত্ত্বেও বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় পর্য্যন্তও বেদ-বিদ্যায় অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন। অদৃষ্টের কি রহস্য, শূদ্রজার পুত্র বেদব্যাস হইলেন বেদের বিভাগকর্ত্তা, এবং তাঁহারই প্রামাণিক ন্যায়কত্ব-মতে শূদ্রগণ বেদাধিকারে বঞ্চিত! যাহাহউক, সত্য কদাচ অভিভূত থাকিবার নহে। সংস্কারান্ধ ভাষ্যকার প্রভৃতিরা যতই চেষ্টা করুন, সত্যাধিকারে জয় অপ্রতিহত; এই জন্যই বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেলায় "পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার সংস্কার লুপ্ত হইবার নহে" অগত্যা ইহাই সমাধান। অথবা সোজা কথায় এরূপ বলিলেও হয় যে, "যে শিখিয়াছে, সে শিখিয়াছে, তার আর হাত কি? কিন্তু সাবধান! আর যেন কেউ না শিখে।" ইহা কি অদ্ভুত ন্যায়ের যুক্তি! এবং সেই জগদ্বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে ইহা কি অযোগ্য

নীতি! ফলে তাৎকালিক-সমাজের উক্তবিষয়িণী সংস্কারান্ধতা এতই প্রবল ছিল যে, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যকেও তৎসমর্থনে বাধ্য করিয়াছিল।

যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমানে বেদাধিকার-বিচ্যুত হইয়া আছে, তাহারা অনেকেই জাতিতেও বস্তুতঃ শূদ্র নহে; অথচ তাহারাও যেন শাস্ত্র-কর্ত্তৃকই বেদ-বারিত, এইরূপ সংস্কারান্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে নীরব ও নিশ্চেষ্ট! ফলে যাহারা বাস্তবিক "শূদ্র" অভিধেয় জাতিতে উৎপন্ন, তাহাদেরও বেদাধিকার নিশ্চিত অবারিত। স্মৃতি-শাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার বারিত হইয়াছে, বেদ-বিরোধিবিধায় তাহা অপ্রমাণ, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। অথবা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এবং তাহাই সমীচীন বোধ হয়; যথা—স্মৃতিশাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা জন্ম বা জাতিগত শূদ্রত্বকে লক্ষ্য করে না; পরন্তু গুণ-কর্ম্মগত শূদ্রত্বকেই লক্ষ্য করে। এইরূপ সিদ্ধান্তই সরল, অকষ্টকল্পিত, যুক্তিযুক্ত, ন্যায়বিচারপূত ও বেদের অবিরুদ্ধ। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতিসমূহের উক্ত নিষেধোক্তি আলোচনা করিলে, এই সিদ্ধান্তই অবিতর্কিতভাবে প্রতিপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। প্রকৃত-পক্ষে ঐ সমস্ত শাস্ত্রে তাহাদিগকেই শূদ্র বলা হইয়াছে, যাহারা নীচ-প্রকৃতিধারী ও হীনকার্য্যকারী। অতএব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি উচ্চতম বেদবিদ্যায় স্বতএব অনধিকারী; সুতরাং তাহাদের জন্য অন্য সুগম শিক্ষাশাস্ত্র ব্যবস্থেয়। বস্তুতঃ ব্যাপার এই; কিন্তু কালসহকারে এই শূদ্রত্ব, জন্ম ও জাতিগত

হইয়া পড়াতেই যত গোল বাধিয়াছে। এমন কি, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যকেও এই ধাঁধায় পড়িয়া সময়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।

আরও দেখুন, গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"। অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মানুসারেই আমি বর্ণবিভাগ করিয়া এই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উৎকৃষ্টগুণ সত্ত্বগুণ যাঁহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের মধ্যে মধ্যমগুণ—অর্থাৎ রিপুর উত্তেজনা—অথচ কার্য্যকারিতাপ্রদ রজোগুণ প্রবল, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং রজস্তমোমিশ্রিত মধ্যমাধম-গুণ-সম্পন্নগণ বৈশ্য, আর অজ্ঞতাপ্রদ সর্ব্বাধম তমোগুণভূয়িষ্ঠ মানবগণই শূদ্র। আবার শিক্ষার উন্নতি-অবনতিতে ইহার বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। কখনও সাত্ত্বিক ব্যক্তি শিক্ষা ও সঙ্গদোষে রাজস—তামস হইয়া পড়িতেছে; কখনওবা শিক্ষা ও সঙ্গাদিগুণে রাজস-তামসগণও সাত্ত্বিক হইতেছে। এই তিনগুণ দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া প্রবল হইতেছে। যথা গীতা—(১৪।১০)

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥"

অর্থাৎ—

অভিভূত করি রজস্তম গুণদ্বয়।
হে ভারত! সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হয়॥
রজোগুণ বাড়ে—যার সত্ত্ব তম পড়ে।
সত্ত্ব রজ অভিভবে তমোগুণ চড়ে॥

অতএব তমোগুণপ্রধান স্বতঃশূদ্রদেরও একেবারে নিরাশ হই- বার কথা নহে; তাঁহারাও শিক্ষা-সঙ্গ-গুণে তমোভাবকে অভিভূত করিয়া এবং উন্নততর গুণসম্পন্ন হইয়া, বেদবিদ্যাধিকার লাভ করিতে পারেন। ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত-তত্ত্ব এবং পুরাকালে এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ১৮৮।৮৯ অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
পূর্ব্বং হি ব্রহ্মণা সৃষ্টং কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্" ॥

ছিলনা বর্ণের ভেদ—ছিল সব ব্রহ্মময়।
ব্রহ্মার এ পূর্ব্বসৃষ্ট—কর্ম্মে ক্রমে জাতি হয় ॥

এইস্থলে জিজ্ঞাসা হইয়াছে, শাস্ত্রমতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিরূপে নির্ব্বাচিত হইবে? তদুত্তরে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা সত্য ও অপর আধ্যাত্মিক গুণনিচয় অধিকার করিয়াছেন, এবং বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাহারা বীরধর্ম্মের সাধক ও তদানুষঙ্গিক গুণাবলী-ধারক, এবং বেদাধ্যয়নশীল, তাহারা ক্ষত্রিয়। যাহারা কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালনকারী এবং আনুষঙ্গিক অপর কতিপয় গুণাধিকারী, বেদাধ্যয়নশীল, তাহারা বৈশ্য, কিন্তু যাহারা একেবারে বেদ-বিদ্যা-বিবর্জ্জিত এবং অন্তর্ব্বাহ্য-শুদ্ধি-বর্জ্জিত, তাহারাই শূদ্র। শূদ্রের একটি বিশেষণ "ত্যক্তবেদঃ" অর্থাৎ ত্যক্ত হইয়াছে বেদ যৎকর্ত্তৃক, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন-বিমুখ, কিন্তু বেদ- অধ্যয়নেই অনধিকারী,—উক্তপদের এরূপ অর্থ কদাচ সরল ও সঙ্গত হইতে পারে না।

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

সর্ব্ব ভক্ষ্যে সদা যার রুচি,
সর্ব্বকর্ম্মকারী যে অশুচি ;
ত্যক্তবেদ অনাচারী যেই,
স্মৃতি-মতে শূদ্র বটে সেই।

"**বেদোঽখিলধর্ম্মমূলম্**"বেদই অখিলধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মার্থ বেদাধ্যয়ন ; অতএব যে অন্তর্বাহ্যে অশুচি ও অনাচারী হইয়া স্বভাবতই ধর্ম্মবিমুখ, বেদাধ্যয়নে তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে, সুতরাং সে-ই "ত্যক্তবেদ" শূদ্র। সে আপন স্বভাবদোষে স্বেচ্ছায় স্বীয় বেদাধিকার হারাইয়াছে, সদুদার শাস্ত্র সঙ্কীর্ণসমাজবিধিরূপে তাহাকে বেদ-বঞ্চিত করে নাই। শাস্ত্রের প্রকৃত-তাৎপর্য্য বিকৃত ভাবিয়া, টীকাভাষ্যকারগণও সাধারণকে তদ্রূপ বুঝাইয়াছেন। সেই মূল-শাস্ত্রবোধের ভুল ক্রমে সমাজে বদ্ধমূল হইয়া, "আকৃতি-প্রকৃতি-গ্রাহ্যা জাতিঃ কর্ম্মানুসারিণী" এই বিস্পষ্ট শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব ক্রমে অস্পষ্টতা পাইয়া, শুধু জন্মগত জাতীয়ত্বই সমাজে সুদৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে উপযুক্ত অধিকারী শূদ্রেরও বেদাধ্যয়নে সামাজিক অনভিমত, ফলিতার্থে তাহারই তিক্তবিষাক্ত ফল।

শূদ্রে চ যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

শূদ্রবংশে জাত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণান্বিত হয়, আর ব্রাহ্মণ-বংশে জাত ব্যক্তি যদি শূদ্র-লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে সে শূদ্র শূদ্র

নহে, সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্র ব্রাহ্মণ বটে, এবং সেই শূদ্র-লক্ষণ ব্রাহ্মণ শূদ্রই বটে।

গুণে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং দোষে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে পারে। পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ লক্ষণ বর্ণন করিয়া পরে বলিলেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

যেরূপ বর্ণলক্ষণ বর্ণিত হইল, তদনুসারে এক বর্ণের লক্ষণ অপরবর্ণজ পুরুষে লক্ষিত হইলে, তাহার লক্ষণানুসারেই বর্ণ-বিনির্ণয় কর্ত্তব্য। তারপর স্মৃতিরাজ মানব ধর্ম্মশাস্ত্র কি বলিতেছেন, দেখুন ঃ—

"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ"

যাহার জন্ম প্রচ্ছন্ন বা যাহার কুল অজ্ঞাত, তাহার স্বকর্ম্মদ্বারাই বর্ণ-বিনির্ণয় হইবে। মনু আরও বলেন,—

তপোবীর্য্যপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

তপস্যা ও জ্ঞান-বলেই মানব যুগে যুগে জন্মগত উৎকর্ষাপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব গুণই শ্রেষ্ঠজাতীয়তার হেতু এবং দোষ বা গুণাভাবই নিকৃষ্টজাতীয়তার হেতু। স্থলান্তরে মনু ত স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। অপর একস্থলে মনু বলিয়াছেন,—

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ।

আর্য্যপিতা ও অনার্য্যমাতার পুত্রও গুণের দ্বারা আর্য্য হইতে পারে। সুবিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্র-কর্ত্তা মহর্ষি গোতম বলেন, **বর্ণান্তর-গমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।**” গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ-ফলেই মনুষ্যের বর্ণান্তর-প্রাপ্তি হয়; অর্থাৎ গুণোৎকর্ষে উৎকৃষ্ট-বর্ণান্তর-প্রাপ্তি ও গুণাপকর্ষে অপকৃষ্টবর্ণান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। অপর, মনুর পরেই বিখ্যাতনামা ব্যবস্থাশাস্ত্রকার মহামুনি অত্রি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন-যুক্ত ও অনিত্য-সংসার-মোহ-মুক্ত, সে-ই ব্রাহ্মণ; যে বীরধর্ম্মা ও সর্ব্ববিধ ক্ষত্রিয়-কর্ম্মা, সেই ক্ষত্রিয়; যে কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাকারী বিহিত বৈশ্যাচারী, সেই বৈশ্য; যে মধু-মাংস-লবণবিক্রয়ী, অজ্ঞ, অনয়ী, সেই শূদ্র; আর যে সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, মহামূর্খ ও সর্ব্বপ্রাণীহিংসন-দক্ষ, সেই চণ্ডাল। অত্রির এই অভিমতে গুণ-ক্রিয়াগত জাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ একবাক্যে বলিতেছেন যে, ঘৃৎসমদের পৌত্র শুনকের পুত্র শৌনক, আপন পুত্রগণকে স্ব স্ব কর্ম্মভেদে বিভক্ত করিলেন, যথা বায়ুপুরাণ——

“পুত্রো ঘৃৎসমদস্য শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ॥
এতস্য বংশসম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ——

“ঘৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।”

ইত্যাদি॥

হরিবংশ অবিকল বায়ুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের যে প্রসিদ্ধ "পুরুষসূক্ত" প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সর্ব্বপণ্ডিত-সমাজেই রূপক-সিদ্ধান্তে সমাদৃত, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের বিভিন্ন-অঙ্গ হইতে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি। যথা পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র সমুদ্ভূত। এস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে, কি প্রকারে পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের পরিচয় প্রতিপন্ন হইবে? মুখ কাহাকে বলা যায়? বাহু কাহাকে বলা যায়? যথা—

"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্
মুখং কিমস্য, কৌবাহূ কা উরু-পাদা উচ্যেতে।"

উত্তর পক্ষ পরিষ্কার '—যথা ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ-স্বরূপ, বাহু ক্ষত্রিয়-স্বরূপ এবং উরু ও চরণই বৈশ্য ও শূদ্র-স্বরূপ।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, বৈদিক-যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে বর্ণভেদ-প্রথা গঠিত হইয়া আসিলে, বর্ণভেদের পক্ষ-পাতিগণ ঋগ্বেদে উক্তবাক্য প্রক্ষিপ্ত করিয়া, আত্মমতস্থ বর্ণভেদ-বিধির প্রাচীন ও সমীচীন সমুৎপত্তি সপ্রমাণিত করিয়াছেন। যাহাহউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করিতেছি না। আমরা বলি, পুরুষসূক্তের উক্তবাক্যে জাতিভেদের মৌলিক-অস্তিত্বের কোন পরিষ্কার প্রমাণ নাই; এবং সায়ণ ও মহীধর প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক টীকাকারগণও উহাকে রূপকার্থ ভিন্ন অন্যার্থে গ্রহণ করেন নাই। পুরুষসূক্তের উক্তবাক্যে মাত্র এই তাৎপর্য্যটুকু ব্যক্ত হইয়াছে যে, চতুর্ব্বর্ণের সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ,

উত্তম ক্ষত্রিয়, মধ্যম বৈশ্য এবং অধম শূদ্র। আর্য্য-সমাজদেহের অঙ্গ-বিভাগ এইরূপ। সূক্তে উক্ত হইয়াছে,

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

বদনে ব্রাহ্মণ জাত, ক্ষত্র বাহুদ্বয়।
উরুতে উৎপন্ন বৈশ্য, পদে শূদ্র হয়॥

যদি কেহ বলে, সুবর্ণ অলঙ্কাররূপে পরিণত হইল, তবে বুঝিতে হইবে যে, অলঙ্কারের পূর্ব্বেই সুবর্ণ ছিল, তদ্রূপ যদি বলা যায়, ব্রাহ্মণ মুখরূপে পরিণত হইল, তবে মুখের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যাহাহউক, ব্রাহ্মণ ও মুখ, এই উভয় শব্দই একবচনান্ত হওয়াতে মুখ শব্দকেও কর্ত্তৃকারক ধরা যাইতে পারে, এরূপ বলা যায়; কিন্তু তৎপরেই দেখা যায় যে, রাজন্য পদে একবচন কিন্তু বাহুপদে দ্বিবচন এবং "কৃতঃ" পদেও একবচন, সুতরাং একবচনান্ত কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না, রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে, অতএব "বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ" বাক্যে, বাহুর পূর্ব্বেই রাজন্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে।

উক্ত-সূক্ত দ্বারা বস্তুতঃ বর্ণ-ভেদের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না; কেবল এতদ্দ্বারা এইমাত্র প্রকাশ পায় যে, একই সমাজ-দেহের চতুরঙ্গ এই চতুর্ব্বর্ণ; ফলে পরবর্ত্তী অপর সমস্ত শাস্ত্রদ্বারাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, এই চতুর্ব্বর্ণ এক মূলবর্ণ হইতে কর্ম্মভেদে উৎপন্ন। মহাভারত বলেন, চতুর্ব্বর্ণের সকলেই এক পবিত্র-ভাষাভাষী। যথা— "চত্বারো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী"

যদি শূদ্র অপর দ্বিজ ত্রিবর্ণ হইতে প্রকৃত স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি হইত, তবে তাহারা কখনও দ্বিজ-ভাষিত-ভাষাভাষী হইতে পারিত না। আমরা দেখিতে পাই যে, মূল আর্য্য ও আর্য্যজাতি পরস্পর বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, কিন্তু শূদ্র অপর আর্য্য বর্ণত্রয়সহ সম্পূর্ণ সমভাষা-ভাষী। বেদে দেখা যায় যে, অনার্য্যেরা "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হয় নাই; তাই পাশ্চাত্য অধ্যাপক-প্রবর মোক্ষমূলর বলেন যে, শূদ্র যে স্বীয় জাতীয়ত্বে আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই শূদ্র; কিন্তু তাহাদের প্রতি কোনরূপ ধর্ম্ম-ক্রিয়াদি চিরকালের জন্য প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। যথা—

"धर्म्मयज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते"

ইত্যাদি।

"বজ্রশূচী" উপনিষদে ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা দৃষ্ট হয়। যথা—জীব বা দেহী আত্মা ব্রাহ্মণ নহে; কারণ জীব বহুবিধ দেহ ধারণ করেন। দেহও ব্রাহ্মণ নহে, কারণ মানুষ-মাত্রেরই দেহ সাধারণতঃ এক প্রকার এবং জরা-মৃত্যুর অধীন; অপিচ, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপই শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে উহা দৃষ্ট হয় না। জন্মজাতিগত ভাবেই ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয় না; কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী-গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ, তদ্রূপ ব্যাস কৈবর্ত্ত-কন্যার গর্ভসম্ভূত, বশিষ্ঠ উর্ব্বশীর অপত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ। অপর কেবল বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই; যেহেতু

ক্ষত্রিয়গণ, অপরাপর অনেক মনুষ্য, বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও জ্ঞানী হইয়া থাকেন। কর্ম্মও ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে, কারণ প্রত্যেকেই কর্ম্মের অধিকারী। ধর্ম্ম বা পুণ্যের দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ নহে; ধর্ম্ম বা পুণ্য-কার্য্য অপরেও করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন। অতএব কেবল জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সংস্কারান্ধ টীকাভাষ্যকারগণের সমক্ষে বজ্রশূচী এক দুর্ভেদ্য সমস্যা সংস্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বজ্রশূচী বস্তুতঃই বজ্রশূচী।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে সত্যকাম জাবালের যে আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বেদ কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর একচেটীয়া বস্তু নহে। গুণের দ্বারা যিনি উপযুক্ত হইবেন, তিনিই বেদ-স্বাধ্যায়ের সমাদৃত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আখ্যান শূদ্রের বেদে অনধিকারের প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে।

সত্যকাম জাবালের বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। সে গুরু-সমীপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনের আকাঙ্খায় নিজ মাতার নিকট স্বীয় গোত্র জানিতে চাহিয়াছিল। মাতা বলিলেন "বৎস! তোমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমি বহুগোত্রীয় পুরুষের পরিচর্য্যায় ছিলাম, সুতরাং তুমি কোন্ গোত্রজ তাহা অনির্দ্দিষ্ট। যাহাহউক, তোমার নাম সত্যকাম এবং আমার নাম জবালা; অতএব জবলার পুত্র-স্বরূপে তুমি "সত্যকাম জাবাল" নাম ব্যবহার করিও।" তৎপর সত্যকাম জাবাল ঋষি হরিদ্রুম গৌতমের নিকটে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম লাভের

প্রার্থনায় উপনীত হইলে, তৎকর্ত্তৃক তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসিত হইল ; তখন সত্যকাম মাতৃসকাশে শ্রুত বিবরণ অবিকল নিবেদন করিলেন। ঋষিবর, সত্যকামের সম্পূর্ণ সরল সত্যবাদিতা এবং নিজের লজ্জাজনক জন্মকুৎসা-বর্ণনেও অপূর্ব্ব অকুণ্ঠতা দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণ ব্যতীত এরূপ কেহ বলিতে পারে না। তুমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সত্যনিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হও নাই ; অতএব আমি তোমাকে দীক্ষা দিব। যাও বৎস! সমিধ্ আনয়ন কর।"

এই আখ্যানে যদি কিছু প্রমাণিত হয়, তবে তাহা এই যে, পুরাকালে একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। পিতা মাতা যে বর্ণেরই হউন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনিই সত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত। তাই অজ্ঞাত-পিতৃগোত্র সত্যকাম কেবল স্বীয় সত্য-নিষ্ঠা-প্রভাবেই ব্রাহ্মণপদে পরিগৃহীত হইল। ৩৭ সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সত্যকাম শূদ্র নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই গৌতম তাহাকে দীক্ষাদানে উদ্যত হইলেন। তিনি সত্যকামের সত্যপরায়ণতা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহাহউক, সত্যপরায়ণতা দ্বারা যদিও ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়, তথাপি উক্ত গুণ যে অবশ্য কেবল ব্রাহ্মণাখ্য শ্রেণীবিশেষেই একচেটীয়া থাকিবে, এমন কথা নহে। তবে যদি বলা যায় যে, যে সত্যপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণ ; তবে ত বর্ণ-ভেদকে নিরাপদে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সত্যকাম-জাবালের ঘটনায় ইহাই ঘটিয়াছে। এই আখ্যানটিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে, সত্যকামের জনয়িতা

ব্রাহ্মণ ছিলেন, বা তৎপরবর্ত্তী অপর বর্ণদ্বয়ের কোন বর্ণীয় ছিলেন; এমন কি, ইহার মাতৃবর্ণ পর্য্যন্ত ইহাতে কিছু মাত্র প্রকাশ পায় নাই; বরং ইহার মাতার বর্ণিত বিবরণে তাহাকে নীচজাতীয়া বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। আচার্য্য গৌতম, বালকের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়াই "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ সত্য কেহ বলিতে পারে না" এই সমাধানে তাহাকে শিষ্য করিলেন। এস্থলে অনুসন্ধান দ্বারা সত্যকামের জন্ম-বৃত্তান্ত জানিয়া তাহার জাতি-নির্ণয় হইল না; পরন্তু তাহার আভ্যন্তরিক চরিত্র-গৌরবেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত বা স্বীকৃত হইল। যদি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সদ্‌গুণই বেদাধিকারপ্রদ ব্রাহ্মণত্বের হেতুরূপে ধরা যায়, অথচ শূদ্রের বেদে অনধিকার নির্ণীত হয়, তবে নিশ্চয় এই বিধিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বা সদুপপত্তি রক্ষিত হইতে পারে না; কেননা শূদ্রবংশীয় যে, সেও নির্দ্দিষ্ট সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে পারে, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারিত্ব অবশ্য তাহার পক্ষে অবারিত। তথাপি যদি ধরা যায় যে, উক্ত নির্দ্দিষ্ট গুণপ্রাপ্ত শূদ্র স্বীয় শূদ্রত্বমুক্ত ও ব্রাহ্মণত্ব-যুক্ত হইয়া তবে বেদাধিকারী হইতে পারে, তাহাতে ফলিতার্থে শূদ্রপক্ষই সমর্থিত হয়। সে হিসাবে বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্রই নহেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব এবং এইরূপে হীন জন্ম হইতে অনেকের কার্য্যতঃ ঋষিত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারিত্ব লাভ হইয়াছে, তাহার পৌরাণিক সাক্ষ্যের অভাব নাই।

৩৬ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞোপবীত-প্রাপ্তির অভাবও শূদ্রের বেদাধিকার-বারণের আনুষঙ্গিক কারণ। উক্ত যজ্ঞোপবীত

ত্রিদণ্ডীযুক্ত এবং বস্ত্র, সূত্র বা কুশ দ্বারা নির্ম্মিত হওয়াই বিধি। যাহাহউক্, যজ্ঞোপবীতের প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিষয়ে মনু বলেন,——

"বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি সউচ্যতে॥
সেই ত "ত্রিদণ্ডী" বাচ্য বুদ্ধি-সিদ্ধ যার—
বাগ্‌দণ্ড মনোদণ্ড কায়দণ্ড আর।

অর্থাৎ যাঁহার কায়, মন ও বাক্য শাসিত এবং সংযত, তিনিই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী! যজ্ঞোপবীতের স্থূল ত্রিদণ্ড এই সূক্ষ্ম ত্রিদণ্ডের বাহ্য নিদর্শন মাত্র। ফলিতার্থে ব্রাহ্মণত্ব বা বেদাধিকারিত্ব কোন স্থূল বাহ্য লক্ষণের অধীন হইতে পারে না। উহা বরং মনূক্ত সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্রেরই অধীন বলা যাইতে পারে। পুরাকালে স্থূল যজ্ঞোপবীত-গ্রহণ অনেক স্থলে ইচ্ছানুযায়ী ছিল মাত্র। যাঁহারা ইহা ধারণ করিতেন, তাঁহারাও ঠিক্ সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেই ধারণ করিতেন না। যাহাহউক, এই যজ্ঞসূত্র কেবল একটি স্থূল বাহ্য চিহ্নমাত্র; সুতরাং উহার অভাব কদাচ প্রকৃত গুণের অভাব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। বস্ত্রোপবীত ত অদ্যাপি তথাকথিত শূদ্র-সংজ্ঞিতগণেরও দেব-পিতৃ-কার্য্যে স্কন্ধদ্বয়-লগ্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়রাজ অশ্বপতি অনেকগুলি ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বাহ্য সূত্রাদির কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সেই আখ্যান ইতঃপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

অতঃপর শূদ্রের বেদাধ্যয়ন-বিষয়িণী আলোচনার সার সংগ্রহ করা যাইতেছে। শূদ্র বেদাধিকার-বর্জ্জিত, এ সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য বা গ্রাহ্য নহে।

বেদে এমন কোন শ্রুতি বা নিষেধ-বিধি নাই, যদ্দ্বারা শূদ্রজাতির বেদাধিকার বারিত হয়। বরং বেদে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শূদ্রের বেদাধিকার-বিষয়িণী শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, সত্যকাম জাবাল, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেদাধিকারের অনুকূল দৃষ্টান্ত দ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। আর যখন সংস্কারান্ধতা ও স্বমতমত্ততার পূর্ণ প্রভাব ভারত-বক্ষে প্রবল ও প্রকট ছিল, সেই সময়েও ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়নে শূদ্র-গণের অবারিত অধিকার ছিল। সুতরাং তত্তৎশাস্ত্রগত অনেক শ্রুতিবাক্য তাঁহারা অবশ্য অব্যাহতভাবে আবৃত্তি ও শিক্ষা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় এবং অনেক ব্রতাদি দেবকার্য্যেও বিবিধ মন্ত্রাদিতে শ্রুতি-উচ্চারণে শূদ্র-দের বাধা ছিলনা এবং এখনও নাই। যদি শূদ্র শব্দে অনার্য্য-জাতি বুঝায়, তবে আর্য্যজাতির ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে বেদ-বারণ-বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে; যেহেতু ভারতীয় প্রাচীন-সাহিত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, আর্য্যজাতির সহিত অনার্য্যজাতির বিবিধ ঘটনায় বহুসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তারপর, যদি মানসিক ও শিক্ষাগত গুণাপকর্ষই শূদ্রত্বের হেতু হয়, তবে সে হেতু দ্বিজ ত্রিবর্ণেও অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণেই বর্ত্তিতে পারে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত জাতি 'শূদ্র' নামে অভিহিত, এবং বেদে অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের মধ্যে

অনেকেই—কি জাতিতত্ত্ব-বিচারে, কি মানসিক সদ্‌গুণাধিকারে, কি শিক্ষা-সাধনায়, কি কর্ম্ম-মর্য্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন অংশেই শূদ্র নহে; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বেদ-বারণ-বিধি তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্রীয় লক্ষণালঙ্কৃত যথার্থ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা জ্ঞান-বিস্তারের বিরোধী হইতে পারেন না, কারণ উহা অনুদার-নীতি ও হীন-বিদ্বেষ-দূষিত-স্বভাবের ফল। বেদবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা ব্রাহ্মণেরই একচেটিয়া থাকা কদাচ বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধারণ্যে বেদ-বিদ্যা বিস্তারিতা হইলে, তাঁহাদের প্রাধান্য কমিবে, এরূপ কল্পনা ও হীন আশঙ্কা অবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। যে ব্রাহ্মণেরা বেদ-বারণ-বিধির পক্ষপাতী, তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই উক্ত পক্ষপাতের একমাত্র হেতু। যাঁহাদিগকে তাঁহারা অনধিকারী বিবেচনা করেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়নে রত হইলে, তবে, ব্রাহ্মণেরাও আপনাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে, অন্ততঃ প্রতিযোগিভাবেও বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকতর প্রযত্নশীল হইবেন, তাহাতে সমাজে সুফলই ফলিবে। এখন ব্রাহ্মণেরাই প্রায় বেদালোচনায় বহির্ভূত হইয়া যথার্থ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন। অতএব যদি বেদপাঠী শূদ্রাপেক্ষা আপনাদের বেদজ্ঞান বর্দ্ধিততর রাখিবার অনুরোধেও তাঁহারা উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে বেদবিদ্যার সাধক হন, তাহাতে সমাজে অতি স্বাস্থ্যকর-পরিবর্ত্তন আসিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নয়নই বিধান করিবে; সন্দেহ নাই। তাহাহইলে ভারতীয়

প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যাদির প্রকৃত পুনরুদ্ধার হইয়া, ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রাদুর্ভূত হইতে পারিবে। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁহার পতিত ভ্রাতাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লন; কিন্তু যিনি সেই পতিতের চিরপতিতাবস্থারই প্রয়াসী, তিনি যে কিরূপ ব্রাহ্মণ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অধুনা অস্মদ্দেশের শত শত শাস্ত্র গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে; বহুদিন হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থাদির ব্যবসায় কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-নীতি-ফলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পরিবার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া, তত্তৎ পরিবারের ধ্বংসের সহিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি সমাজমধ্যে উদারভাবে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ও বিস্তারিত থাকিত, তবে অবশ্য শতচেষ্টায়ও কোথাও না কোথাও অদ্যাপি তৎসমস্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত। সংস্কারান্ধতা বা গোঁড়ামীর হুজুকে দেশের মঙ্গল ত কিছুই হয় নাই, অধিকন্তু যাহারা সমাজে অবজ্ঞাত ও অধঃপতিত জাতি, তাহাদের উন্নয়নে প্রবল বাধা পড়িয়াছে। কি পরার্থপরতা, কি স্বার্থপরতা, কি শাস্ত্রীয়-বিধান, অপক্ষপাতবিচার ও যুক্তিপ্রমাণ, এ সমস্তই "উত্তরোত্তর সমাজের সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতি হউক" এই অভিমতি বা নীতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে! পরার্থপরতার অব্যাঘাতেই যথার্থ স্বার্থপরতা সিদ্ধ হয়। মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানোন্নতি আবশ্যক, এই সাধারণ ও স্বাভাবিক নীতি-সূত্রের উপরই শূদ্রের বেদাধিকার স্বতঃ স্থাপিত। ২৫ সূত্রে "**মনুষ্যাধিকারাৎ**" বাক্যে এই সিদ্ধান্তই সূচিত, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী

সূত্রনিচয়ে যে এই 'মনুষ্য' শব্দের সঙ্কীর্ণার্থ ঘটাইয়া দ্বিজ-ত্রিবর্ণের মধ্যেই উক্ত বেদাধিকার বদ্ধ রাখার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কদাচ প্রশস্ত পরিগ্রাহ্য হইতে পারে না ; ফলে সম্ভবতঃ উক্ত সূত্রগুলি প্রক্ষিপ্ত।

---

৩৯ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কম্পন হেতু প্রাণই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদে (১১। ৬-২) উক্ত হইয়াছে—**"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"**

অর্থাৎ—

যাহা কিছু এই সর্ব্বজগন্ময়।
প্রয়াণেতে প্রাণ প্রকম্পিত হয়॥
মহদ্ভয় সমুদ্যত বজ্র প্রায়।
যারা জানে তারা অমৃতত্ব পায়॥

এ স্থানে 'প্রাণ' পদের অর্থ প্রাণ-বায়ু অথবা ব্রহ্ম, তাহাই এই সূত্রের বিচার্য্য বিষয়। ইহার ভীষণত্ব উক্ত হওয়াতে যে এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই বিজ্ঞেয় হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব ; অতএব ইহা বিবেচনা করাই অসঙ্গত যে, মূল-বিষয় ছাড়িয়া এতদ্দ্বারা কেবল বাতাসেরই স্তুতি করা হইয়াছে। আর বাতাসকে জানিয়াই বা কে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে? কঠোপনিষদে এইরূপ আর একটি শ্রুতি আছে, তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের ভীষণ-সত্ত্ব-প্রাধান্যই প্রতিপন্ন হয়। যথা—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"॥

অর্থাৎ—

এঁর ভয়ে ভীত হ'য়ে, বৈশ্বানর বিশ্ব দহে,
ভয়ে ভানু তাপে বসুধায়।
এঁর ভয়ে ইন্দ্র ভীত, বায়ু ভয়ে প্রবাহিত,
পঞ্চমতঃ ভয়ে মৃত্যু ধায়॥

বেদে ঠিক এই তাৎপর্য্যের আর একটি শ্রুতি এই যে,—

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ—

এঁর ভয়ে হ'য়ে ভীত, বায়ু হয় প্রবাহিত,
এঁর ভয়ে সূর্য্য সমুদিত।
ভীত ইন্দ্র এঁর ভয়ে, এঁর ভয়ে অগ্নি দহে,
পঞ্চমতঃ মৃত্যু প্রধাবিত॥

কোথাও বা আলঙ্কারিকভাবেও 'প্রাণ' পদের প্রয়োগ হইয়াছে ; যথা—"**প্রাণস্য প্রাণম্**" এই স্থলে এই "প্রাণের প্রাণ" পদদ্বয় সেই ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

৪০ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জ্যোতিই ব্রহ্ম ; যেহেতু ঔপনিষদী শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্বই দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭। ১২-৩) দৃষ্ট হয়,—**এষঃ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণা ভিনিষ্পদ্যতে।**

অর্থাৎ—

ঐ শরীর হ'তে সমুত্থান করি,
সেই সম্প্রসাদ স্ব-স্বরূপ ধরি,
সে পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপে তখন,
করে সে আপনি আত্মসমর্পণ।

এই সূত্রের মীমাংসিতব্য বিষয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত "জ্যোতি" শব্দ সূর্য্যাদির জ্যোতির ন্যায় সাধারণ আলোক বুঝাইবেনা, এতদ্দ্বারা সেই ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্ম এবং শ্রুতিতে পরজ্যোতি পদে পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

৪১ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আকাশই ব্রহ্ম ; যেহেতু নাম-রূপ উপাধির অতীত রূপেই এ তত্ত্ব পরিচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১৪-১) উক্ত হইয়াছে,—

"**আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি স্তূয়তে।**"

অর্থাৎ—

'আকাশ' পদেতে হন পরিচিত যিনি।
নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক তিনি॥
এই সর্ব্ব নাম-রূপ যাঁর অন্তর্ভূ্ত।
ব্রহ্ম-আত্মা-অমৃত-স্বরূপে তিনি স্তুত॥

এখানে স্পষ্টই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, সমস্ত নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক-স্বরূপে উক্ত এই "আকাশ" পদ "ব্রহ্ম" পদেরই প্রতিশব্দ-

বিশেষ। পরন্তু উহা এস্থলে অনিত্য ভৌতিক আকাশ বা ব্যোমের বাচক নয়। ব্রহ্মাকে যেমন ইতঃপূর্ব্বে আলঙ্কারিকভাবে 'জ্যোতি' বলা হইয়াছে, এস্থলেও তদ্রূপ আলঙ্কারিকভাবে 'আকাশ' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ নামরূপ-উপাধির পূর্ণ প্রকাশ স্বয়ং পূর্ণ নিরুপাধিক ব্যতীত অপর কোন সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৭ । ৩-২) বলেন—

"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।

এই সর্ব্ব জীবেতে জীবাত্মসমন্বিত—
প্রবেশিয়ে নাম-রূপ করি প্রকাশিত।

উপরোক্ত-শ্রুতিতে অতি বিশদরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই যাবদীয় নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক। এস্থলে জীবাত্মা কর্ত্তৃকই নামরূপাদি-প্রকাশ কথিত হওয়াতেও উক্ত তাৎপর্য্যের কোন বিপর্য্যয় ঘটে নাই; যেহেতু পরমাত্মাই জীবাত্মরূপে জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপাদির প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই শ্রুত্যুক্তি। ফলিতার্থে জীবাত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ নহেন।

৪২ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জীবের সুষুপ্তি-সময়ে ও মৃত্যুতে জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া যান; অতএব জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা পৃথক্তত্ত্ব, এরূপ সিদ্ধান্ত অবিশুদ্ধ; যেহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার পারমার্থিক একত্বই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত-সম্মত।

বক্ষ্যমাণ শ্রৌত-প্রসঙ্গের উদ্দেশ্যই পরমাত্মতত্ত্ব-প্রতিপাদন, সুতরাং সুষুপ্তি সময়ে দেহ হইতে দেহীর অর্থাৎ জীবাত্মার উৎক্রমণ

জন্য উক্ত জীবাত্মার কোন স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে; যেহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য-প্রতিপাদন শ্রুতিবিরুদ্ধ।

৪৩ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, 'পতি' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ থাকায় তদ্দ্বারা ব্রহ্মই বেদিতব্য।

"স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" ইত্যাদি শ্রৌতবাক্যে পরমাত্মাই প্রতিপাদিত, যেহেতু 'সর্ব্ব' অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ামক, বিশ্বের প্রভু ও বিশ্বের পাতা সেই বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা ভিন্ন জীবাত্মা কদাচ হইতে পারে না।

(৩য় পাদ সমাপ্ত।)

চতুর্থ পাদ।

প্রথমাধ্যায়ের এই চতুর্থ পাদে ২৮টী সূত্র আছে। ইহার প্রথম সপ্তসূত্র-রচিত একটি অধিকরণে কঠোপনিষদুক্ত "অব্যক্ত" শব্দে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "প্রধান" কিম্বা "সূক্ষ্মশরীর" সূচিত হয়, তাহাই বিচারিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী তিন সূত্রে (৮ম হইতে ১০ম) দ্বিতীয় অধিকরণ গঠিত। তাহাতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত "অজা" পদে যে সাংখ্যোক্ত প্রধানকে বুঝায় না, পরন্তু ব্রাহ্মীশক্তি অথবা আদি-কারণ-শক্তিকেই বুঝায়, তাহা সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। তৎপর আর তিন সূত্রে—অর্থাৎ ১১শ হইতে ১৩শ সূত্রে তৃতীয় অধিকরণ অধিষ্ঠিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত "পঞ্চ-পঞ্চজন" পদে যে সাংখ্য-দর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বুঝায় না, এই অধিকরণে তাহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। চতুর্থ অধিকরণটি ১৪শ ও ১৫শ, এই সূত্রদ্বয়গত;

এই অধিকরণের বিচারিত বিষয় ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপতাই যে বিশ্বের কারণস্বরূপ, এ তত্ত্বে সর্ব্বোপনিষদের সিদ্ধান্তই অবিসংবাদে সমন্বিত। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ সূত্র-সংগঠিত পঞ্চম অধিকরণে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কৌষিতকী উপনিষদের কতিপয় শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মই বিজ্ঞেয়, কিন্তু প্রাণবায়ু বা জীবাত্মা নহে। ১৯শ হইতে ২২শ সূত্র পর্য্যন্ত ষষ্ঠ অধিকরণ; তাহাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত **"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ"** ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞেয়, পরন্তু জীবাত্মতত্ত্ব কদাচ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত; তৎপর ২৩শ সূত্র হইতে ২৭ সূত্র পর্য্যন্ত সপ্তম অধিকরণ; তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেবল মাত্র "নিমিত্ত-কারণ" নহেন, কিন্তু "উপাদান-কারণ"ও বটেন। অবশেষে ২৮শ সূত্রাত্মক অষ্টম অধিকরণের সিদ্ধান্ত এই যে, সাংখ্য-মতের খণ্ডন বিশ্বসৃষ্টির মূলকারণনির্ণায়ক পরমাণুবাদ প্রভৃতির প্রতিও প্রযোজ্য।

বৈদান্তিকগণের সহিত সাংখ্যমতবাদিগণের অবিশ্রান্ত বিচার-সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই অধ্যায়ের অধিকাংশ কেবল সাংখ্যদর্শনের 'প্রধান'বাদের খণ্ডনেই প্রায় পর্য্যবসিত। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, বিশ্বের কারণ একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা; পরন্তু সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'কে বিশ্বের কারণ বলিয়া উপনিষৎ—অর্থাৎ বেদান্তে স্বীকার করা হয় নাই। ফলে সাংখ্যোক্ত প্রধানই বেদান্তোক্ত ব্রাহ্মীশক্তি বা মায়ারূপে বৈদান্তিকগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। তবে পার্থক্য এই যে, বৈদান্তিকগণের মতে ঐ মায়া ব্রহ্মের শক্তি

বিধায়, উহা শক্তিমান্ ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অধীন, কিন্তু সাংখ্যবাদিগণের সিদ্ধান্তে জড়জগতে প্রধানই হেত্বন্তর-নিরপেক্ষ স্বাধীন ও সর্ব্বেসর্ব্বা। জড়জগতের হেতু যে মায়া, তাহা বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন, কিন্তু উহা ব্রহ্মের শক্তি মাত্র জানিয়া, উহাকে অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হন। পক্ষান্তরে, সাংখ্যবাদিগণ প্রধানকে অতিক্রম করেন না ; পরন্তু সৃষ্টিমূলতত্ত্ব-সিদ্ধান্তে উহাতেই উপসংহৃত হন।

বাস্তবিক কতিপয় উপনিষদে এই উভয় মতেরই সমীকরণ দৃষ্ট হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু বৈদান্তিকগণ স্বমতদার্ঢ্যে এই স্থির সিদ্ধান্তে সমাগত হন যে, কোন উপনিষদের কোন শ্রুতির কুত্রাপি সাংখ্যোক্ত 'প্রধানবাদ' প্রশ্রয় পায় নাই। ফলে যেখানে যেখানে—যে কোন ঔপনিষদী শ্রুতির যে কোন উক্তিতে সাংখ্যমত-সমর্থনের সন্দেহ হইয়াছে, সেই খানেই তাঁহারা সেই শ্রুতির সেই উক্তির বেদান্ত-মতানুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন।

বাস্তবিক ভারতের ষড়্দর্শন প্রকৃত সমাহিতভাবে অধীত ও আধ্যাত্মিকধীষণা-সহযোগে সূক্ষ্মভাবে বিচারিত হইলে, তাহাদের স্ব স্ব মতসিদ্ধান্তে পরস্পর কোন বিরোধ বা বিসম্বাদ দৃষ্ট হইবে না। বাস্তবিক ছয়টি দর্শন যেন একটি সোপানেরই ছয়টি পদ্ধতি বা ধাপ। ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন যেন তাহার সর্ব্বোচ্চ বা শেষ ধাপ। ক্রমশঃ পদ্ধতি-পরম্পরায় এই সোপান অতিক্রম করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান-সৌধে সমারোহণ করা যায়। একেবারেই কেহ সর্ব্বোচ্চ ধাপে উঠিয়া সৌধপ্রবেশে সমর্থ

হয় না; সুতরাং উদ্দেশ্যের অভিন্নতায়—কেবল পদ্ধতির ভিন্নতায় প্রকৃতপক্ষে দর্শনশাস্ত্রগুলি পরস্পর অবিরোধী। এই মূল সত্য বিস্মৃত বা উপেক্ষিত হইলে, আমরা চিরকাল দর্শনশাস্ত্রের 'গোলোক ধাঁধায়' পড়িয়া ঘুরিব; কদাচ সর্ব্বমত-সমন্বিত সারসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্বাধ্যায়ের প্রকৃত সুফল-লাভে সমর্থ হইব না; অথবা কোন একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের মৌলিকত্ব অনুভবে অধিকারী হইতে পারিবনা।

কোন একটি সত্য হইতে অধিকার-ক্রমানুসারে তদুচ্চতর সত্যে আরোহণ স্বাভাবিক নিয়ম; অতএব নিম্নস্থ সত্য সত্যই নহে, অথবা উচ্চতর সত্যের অস্তিত্বই নাই, এরূপ কোন সিদ্ধান্ত দার্শনিক বিচারে স্বতই অনুপপন্ন ও অসঙ্গত। সত্য সকলই সত্য, তবে সাধকের অধিকার-ভেদে তৎসমস্ত সেবিত ও সাধিত। যাহাহউক, এক্ষণে বেদান্তসূত্রের চতুর্থপাদের সূত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১ম। आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च।

২য়। सूक्ष्मन्तु तदर्हत्वात्।

৩য়। तदधीनत्वादर्थवत्।

৪র্থ। ज्ञेयत्वावचनाच्च।

৫ম। वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्।

৬ষ্ঠ। त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च।

৭ম। महद्वच्च।

८। चमसवदविशेषात् ।

९। ज्योतिरुपक्रमात्तु तथा ह्यधीयत एके ।

१०। कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ।

(ভাষ্যানুবাদ।)

১। কতিপয় ঔপনিষদী শ্রুতিদ্বারা যে সাংখ্যোক্ত প্রধানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ; যেহেতু আপাততঃ প্রধান-লক্ষণ-প্রতিপাদক শ্রৌত বাক্য যে প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম-শরীরের রূপক-রূপেই বিন্যস্ত, তাহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

২। লক্ষণের উপযোগিতা হেতু "অব্যক্ত" শব্দে সূক্ষ্ম শরীরই সূচিত হইতেছে, কিন্তু "প্রধান" নহে।

৩। শাস্ত্র-যুক্তিমতে অব্যক্ততত্ত্ব ব্রহ্মেরই অধীন বিধায়, তদ্দ্বারা সাংখ্যোক্ত স্বাধীন "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৪। অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব শাস্ত্রে উক্ত না হওয়ায় "অব্যক্ত" পদে "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৫। সাংখ্যোক্ত "প্রধান" অপ্রাজ্ঞ বিধায়, শাস্ত্রোক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হয় না; পরন্তু প্রাজ্ঞ আত্মাই প্রতিপাদিত হন।

৬। প্রশ্নানুসারে তিনটি তত্ত্বের উপন্যাস হইয়াছে, সুতরাং তন্মধ্যে অব্যক্ত স্বরূপে প্রধান সূচিত হয় নাই।

৭। "অব্যক্ত" পদ "মহৎ" পদের ন্যায় প্রযুক্ত হওয়াতে, তদ্দ্বারা প্রধান পরিব্যক্ত হইতে পারে না।

৮। "চমস" পদের প্রয়োগবৎ "অজা" পদ রূপকার্থে প্রযুক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা প্রধান প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৯। কতিপয় শাখাতে ভূত-সৃষ্টির উপক্রম স্বরূপ জ্যোতিস্তত্ত্ব "অজা" পদে অধীত হওয়ায়, "অজা" পদে "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

১০। শ্রুতিবিশেষে রূপকভাবে "মধু" শব্দে সূর্য্য সূচিত হওয়ায়, এবং শাস্ত্রে ঐরূপ আরও রূপকোক্তি থাকায়, ছাগী-অর্থ-প্রকাশক "অজা" শব্দ দ্বারাও রূপক-রূপে সৃষ্টির মূল ভৌতিককারণতত্ত্ব অবিরোধিভাবেই সূচিত হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা সাংখ্যোক্ত "প্রধান" সূচিত হয় নাই।

(১ম হইতে ৭ম সূত্র পর্য্যন্ত ১ অধিকরণ, ৮ম হইতে ১০ম অন্য এক অধিকরণ হইবে।)

বৈদান্তিকেরা বলেন যে, সাংখ্যমতের কোন বেদানুমোদিত প্রামাণিকতা নাই। এতৎপ্রতিবাদে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ কঠোপ-নিষদুক্ত (১-৩। ১১) একটি শ্রুতি নির্দ্দেশ করেন, যথা—"**মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।**" অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ। সাংখ্যশাস্ত্রেও এই ত্রিতত্ত্ব স্বীকৃত; সুতরাং উক্ত ঔপনিষদী শ্রুতি দ্বারা সাংখ্যমতের মূলতত্ত্ব বেদ-প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে, ইহাই সাংখ্যবাদিগণের সিদ্ধান্ত। মূল জ্ঞানতত্ত্ব বা অনুভূতিই মহৎ। সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-তত্ত্বই অব্যক্ত। এই অব্যক্তসত্তাত্মিকা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই স্থূলতঃ ও মূলতঃ সর্ব্বজগতের সৃষ্টিশক্তিস্বরূপিণী; আর পুরুষ জীবাত্মা। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ। বেদান্তবাদীরা বলেন, "সাংখ্যবাদীরা শ্রৌতবাক্যের সহিত কেবল তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কতিপয় শব্দ-সাম্য

পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত প্রকৃত অর্থসাম্য পান নাই। ফলে ঐ সমস্ত শব্দগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য বা অর্থ কি, তাহা প্রকৃতপক্ষে অবধারণ করিতে হইলে, মূল আলোচ্য বিষয়টি কি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং সমগ্র উপনিষৎখানি অধ্যয়নপূর্ব্বক প্রকরণ ও উপক্রম-উপসংহার বিচার করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু শুধু এখানকার ওখানকার দু'চারিটা ছুটা ছুটা উক্তির শাব্দিক অর্থের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আলোচ্য শ্রুতিটির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে একটি রূপকোক্তি শ্রুতি দৃষ্ট হয়। উহাতে আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলা হইয়াছে, ইত্যাদি। শ্রুতিটি এই—

"आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥"

অর্থাৎ—

আত্মাকে জানিবে রথী, রথ জান দেহ।
বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগ্রহ॥
ইন্দ্রিয়েরা অশ্ব তায় বিষয়ের পথে।
দেহ-মনযুক্ত আত্মা 'ভোক্তা' জ্ঞানি-মতে॥

তৎপরে উক্ত হইয়াছে যে, যে সাধক ইন্দ্রিয়-সংযম-সিদ্ধ, সে-ই সর্ব্বতত্ত্বাতীত পরমাত্ম-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভে অধিকারী।

শ্রুতি যথা—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।

অর্থাৎ—

ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ ; অর্থ-পরে মনস্তত্ত্ব।

মনের পরেতে বুদ্ধি, বুদ্ধি-পরে মহত্তত্ত্ব॥

মহৎ-পরে অব্যক্ত, পুরুষ পরেতে তার।

সেই কাষ্ঠা, পরাগতি, তারপর নাহি আর॥

আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রৌত বাক্যটির ন্যায় পরোদ্ধৃত শ্রৌত-বাক্যটিতেও ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পাইলাম। আবার পরোদ্ধৃত বাক্যটিতে পূর্ব্বোদ্ধৃতের ন্যায় 'আত্মা' শব্দটিও পাইলাম। কিন্তু, পার্থক্য মাত্র এই যে, প্রথমোক্ত বাক্যটির আত্মা জীবাত্মা, ও পরবর্ত্তী বাক্যোক্ত আত্মা পরমাত্মা। ফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে পরমার্থতঃ অভিন্ন, এ সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তবে কেবলমাত্র প্রথমের ন্যায় দ্বিতীয় বাক্যটিতে শরীরের উল্লেখ নাই। অতএব ইহার সমাধান এই যে, দ্বিতীয় উক্তির "অব্যক্ত" পদেই প্রথমোক্তিস্থ 'শরীর' সূচিত হইতেছে। সুতরাং এ স্থলে 'অব্যক্ত' পদে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত বিশ্ব-মূল-কারণরূপ প্রধানকে বুঝায় না। তবে কি প্রকারে এই স্থূল সুব্যক্ত ভৌতিক শরীর "অব্যক্ত" শব্দে সূচিত হইতে পারে?

তদুত্তরে (২য় সূত্র) বলা যায় যে, উক্ত বাক্যে "কারণ-শরীর" বা "লিঙ্গশরীর"কে বুঝাইতেছে। এই 'লিঙ্গশরীর' হইতেই ভৌতিক স্থূলদেহ সঞ্জাত। কখন কখন কারণবাচক শব্দ কার্য্যবাচকরূপে গৃহীত হয়। যথা স্বয়ং ঋগ্বেদ (৯-৪৬-৪) বলিতেছেন—"**গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং**"—অর্থাৎ গরুর সহিত সোম মিশাও। এস্থলে 'গরু' অর্থ—গরুর দুগ্ধ। ফলে দুগ্ধসহ সোমমিশ্রণেরই বিধি। অতএব "অব্যক্ত" পদ-প্রয়োগে ভৌতিক স্থূল-শরীর-সূচনারই বা বাধা কি ?

"বৃহদারণ্যক উপনিষদ্" (১-৪।৭) বলেন,—"**তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি**।" অর্থাৎ এসব কিছুই ছিল না; সমস্ত অব্যক্ত ছিল। তাৎপর্য্য এই যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নামরূপ-উপাধিযুক্ত বহুভেদবিশিষ্ট সুব্যক্ত জগৎকেও অব্যক্ত বলা যায়; যেহেতু ইহা—সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাদি-সর্ব্ববিধ-ভেদশূন্য হইয়া, বীজশক্তিরূপে অবস্থিত ছিল। অতএব যেমন এই সুব্যক্ত জড়-জগতের একটি অব্যক্ত বীজীভূত অবস্থা আছে, তদ্রূপ এই সুব্যক্ত স্থূল শরীরেরও একটি অব্যক্ত অবস্থা বা কারণ-শরীর আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, (৩য় সূত্র) জগতের অব্যক্ত কারণাবস্থাই সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান কি না ? ইহাতে সাংখ্যবাদিগণ বলেন যে, "হে বৈদান্তিকগণ! নাম-রূপ-উপাধি প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বে যে এই জগতের অব্যক্তাবস্থা ছিল, তাহা তোমরা স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারা আমাদেরই মত সমর্থন করা হয়।" তদুত্তরে বৈদান্তিকেরা বলেন যে, "না, তাহা নহে। যদি আমরা জগতের আদি অব্যক্ত

অবস্থাকে ব্যক্ত জগতের স্বাধীন কারণরূপে স্বীকার করিতাম, তবেই তোমাদের মত সমর্থন করা হইত, নচেৎ নহে।” বাস্তবিক বৈদান্তিকেরা জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী অব্যক্ত কারণাবস্থা স্বীকার করিলেও, সেই অব্যক্ততত্ত্বকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু তাহাকে পরমাত্মা ব্রহ্মেরই অধীন বলেন। ফলে যদি এই ভৌতিক জগতের কারণস্বরূপ একটা পূর্ব্ববর্ত্তী বীজীভূত অব্যক্তাবস্থা স্বীকার না করা যায়, তবে ঈশ্বর ‘সৃষ্টিকর্ত্তা’ বলিয়াই অভিহিত হইতে পারেন না। তবে ঈশ্বরের কোন কার্য্যই থাকে না, সুতরাং কার্য্যের কারণরূপিণী বীজশক্তির অভাবে কার্য্যরূপ সৃষ্টিও থাকে না। অতএব ঐ কারণরূপা বীজশক্তিই বৈদান্তিকগণের মতে মায়া। ‘আকাশ’ ‘অক্ষর’ এবং ঐরূপ সমতাৎপর্য্যবোধক পদেও মায়াই সূচিত হইয়া থাকে। **“এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ-ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতিঃ।”** (বৃ: উ:—৩। ৮। ২) অর্থাৎ—হে গার্গি! এই অক্ষরে নিশ্চয় আকাশ ওতঃপ্রোতঃ ভাবে থাকে; ইহা বেদবাক্য। **“অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ”** (মু: উ:, ২—২। ২); অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠতর। **“মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি, মায়িনন্তু মহেশ্বরং”** (শ্বে: উ:—৪। ১০) অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি জানিবে, এবং মায়া যাঁহার, তাঁহাকেই মহেশ্বর জানিবে। কঠোপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিস্থ ‘মহৎ’ শব্দে যদি জীবাত্মা বুঝায়, তবে “অব্যক্ত” শব্দেও বেদান্তদর্শনের “মায়া” বুঝাইবে। অতএব “অব্যক্ত” শব্দের অর্থ যেরূপই গৃহীত হউক; অর্থাৎ, উক্ত শব্দে জীবের সূক্ষ্ম কারণ-দেহকেই বুঝাউক, বা এই স্থূল ভৌতিক জগতের

বীজীভূত সূক্ষ্ম কারণাবস্থাই বুঝাউক্, ফলে তদ্দারা সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জগতের স্বাধীন আদিকারণরূপে কথিত প্রধানকে কখনও বুঝাইবেনা।

৪র্থ সূত্র।—কঠোপনিষদুক্ত ঐ 'অব্যক্ত' পদে সাংখ্যদর্শনের "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যেহেতু পুরুষের মুক্তিলাভার্থ প্রকৃতিকে জানা আবশ্যক; কিন্তু কঠ-শ্রুতির "অব্যক্ত"-কোনরূপেই জ্ঞেয় বা ধ্যেয়রূপে উক্ত হয় নাই; অতএব এই "অব্যক্ত" ও সাংখ্যের প্রকৃতি বা "প্রধান" কদাচ এক তত্ত্ব হইতে পারে না।

৫ম সূত্র।—এক্ষণে সাংখ্যপক্ষ এক নবতর্কে অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন যে, "প্রধান" জ্ঞানবিষয়ীভূত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে বৈদান্তিকেরা বলেন যে, সাংখ্যপক্ষের প্রদর্শিত শাস্ত্রোক্তিতে প্রধান সূচিত হয় নাই; পরন্তু পরমাত্মাই সূচিত হইয়াছেন।

সাংখ্যপক্ষীয় সেই শ্রুতিটি এই, যথা কঠোপনিষদ্ (১১—৩। ১৫)—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যত্।
অনাদ্যনন্তং মহতঃপরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাত্ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ—

অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ অব্যয়।
অরস-অগন্ধ নিত্যসত্ত্বময়॥

অনাদ্যন্ত-ধ্রুব মহতের পর।
যাঁরে জেনে মৃত্যু-মুখ-মুক্ত নর॥

সাংখ্য-পক্ষীয় সিদ্ধান্ত এই যে, এই শ্রুতি তাঁহাদের "প্রধান"কে প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু বেদান্তপক্ষীয়েরা বলেন যে, না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু সমগ্র অধ্যায়টির মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব; সুতরাং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া প্রধানকে বুঝাইলে, স্পষ্টতঃ বিষয়-বিপর্য্যয় দোষ ঘটে; অতএব আরব্ধ অমীমাংসিত বিষয় স্তব্ধ হয় ও এক নব বিষয়ের অবতারণা ঘটে। সমগ্র অধ্যায়টিতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, মানব ব্রহ্মকে জানিলেই—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই মুক্তিলাভে সমর্থ হয়; কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রমতে কেবল প্রধানকে জানিলেই জীবের মুক্তি হয় না, পরন্তু সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত 'পুরুষ'কেও জানিতে হইবে; অর্থাৎ পুরুষের আত্মজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষলাভ সম্ভাবিত নহে। বৈদান্তিকমতে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান পরমার্থতঃ এক; যেহেতু আত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ এক; মায়া-মুক্তাবস্থায় সেই একত্বানুভূতি এবং একত্বপরিণতিই মুক্তি।

৬ষ্ঠ সূত্র।—এ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আলোচ্য "অব্যক্ত" পদে কদাচ "প্রধান" ব্যক্ত হইতে পারে না। যেহেতু কঠোপনিষদেই উক্ত হইয়াছে যে, যম নচিকেতাকে মাত্র তিনটি তত্ত্বের বিষয় বলিয়াছেন, যথা—অগ্নিচয়ন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। নচিকেতা কর্তৃক "প্রধান" সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন উত্তরও সম্ভাবিত নহে; অতএব 'অব্যক্ত' কদাচ 'প্রধান' হইতে পারে না। তদুত্তরে সাংখ্যপক্ষ বলেন যে, নচিকেতা

প্রকৃতপক্ষে অগ্নিচয়ন, এবং আত্মা, এই দুই বিষয়ে মাত্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তোমরা বেদান্তপক্ষীয়েরাই স্বীকার করিতেছ যে, যম তিনটি তত্ত্ব বলিয়াছিলেন; সুতরাং নচিকেতা কর্ত্তৃক প্রধানতত্ত্ব জিজ্ঞাসিত না হইলেও, যমকথিত ঐ অতিরিক্ত তত্ত্বটিকে 'প্রধান' বলিয়া বুঝিতে বাধা কি? এতৎ প্রত্যুত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন যে, যদিও জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুইটি বিষয়ই যম কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, উহা আপাততঃ গণনায় দুইটি বিষয় হইলেও, ফলিতার্থে একটি বিষয়ই বটে; কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ এক বা অভিন্ন।

৭ম সূত্র—সাংখ্যদর্শনের 'মহৎ' পদটি যে অর্থে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, বেদান্তের দার্শনিক পরিভাষায় তাহা তদর্থে গৃহীত বা প্রযুক্ত হয় নাই। সাংখ্যমতে 'মহৎ' বুদ্ধি বা জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম বিকাশ; কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে তদ্দ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য; যথা— "**বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ** (কঃ উঃ ১—৩। ১০) অর্থাৎ মহান্ আত্মা বা পরমাত্মা বুদ্ধিতত্ত্বের অতীত তত্ত্ব। "**মহান্তং বিভুমাত্মানং।**" (কঃ উঃ ১—২। ২২) সর্ব্বব্যাপী আত্মাই মহান্ আত্মা। '**বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং।**' (শ্বেঃ উঃ, ৩। ৮) অর্থাৎ এই মহৎপুরুষ পরমাত্মাকে আমি জানি; ইত্যাদি। যাহা হউক, "মহৎ" শব্দের তাৎপর্য্য সাংখ্যে যেরূপ, বেদান্তে তাহা হইতে ভিন্নরূপ; এবং তদ্রূপ "অব্যক্ত" শব্দের তাৎপর্য্য সাংখ্যে যেরূপ, বেদান্তে তাহা হইতে ভিন্নরূপ; সুতরাং বেদান্ত-মতে "অব্যক্ত" পদে কদাচ সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৮ম সূত্র।—যে শ্রুতিটি মূল আলোচ্য বিষয়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তাহা এই—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां ।
बह्वीःप्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ॥
अजो ह्येको जुषमानोऽनुशेते ।
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥

অর্থাৎ

এক অজা রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণ ধরে।
স্ব-রূপ বিবিধ প্রজা প্রসব সে করে॥
এক অজ ভালবাসে তার পাশে থাকে।
অন্য অজ উপভোগি ত্যাগ করে তাকে॥

এই আপাতপ্রতীয়মান রূপকরূপী শ্রৌতবাক্যটির শাব্দিক অর্থ অবশ্য সরল, কিন্তু ইহার প্রকৃতার্থ গভীর। এই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থের রহস্য-ব্যাখ্যায় সাংখ্যসম্প্রদায় বলেন যে 'অজা' পদে প্রধানই প্রতিপাদ্য; যেহেতু ইহাই জগতের আদিকারণ। লোহিত, কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই তিন বর্ণ প্রকৃতি বা প্রধানের রজঃ, তমঃ ও সত্ব গুণের লক্ষণ। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রধানের স্বরূপ। ইহা হইতে ত্রিগুণাত্মক জগতের সৃষ্টি। আর বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে পুরুষ (তত্বতঃ এক হইয়াও) দ্বিবিধ। ইহাই দুই অজ। প্রকৃতিও স্বয়ম্ভূজা বলিয়া অজা, এবং এই আত্মরূপী পুরুষও স্বয়ম্ভূত, বা স্বয়ম্ভূ সুতরাং অজ। এই দুয়ের মধ্যে বদ্ধ পুরুষ প্রকৃতির প্রেমাধীন হইয়া প্রকৃতিতেই লাগিয়া থাকে;

সুতরাং মুক্তিলাভ করিতে পারে না। আর মুক্ত পুরুষ প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিয়া, অর্থাৎ তাহার তত্ত্ব জানিয়া, তাহাকে ত্যাগ করে। বদ্ধজীব তত্ত্বজ্ঞানাভাবে আপনার স্বরূপ চিনিতে না পারিয়া প্রকৃতির ভোগে ভুলিয়া থাকে ; আর তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ আত্মতত্ত্বলাভে অভ্রান্ত ও বলবন্ত হইয়া, প্রকৃতির প্রেমজাল ছিন্ন করিয়া, অব্যয় মোক্ষ-পদের যোগ্য হয়। এতাবতা সাংখ্যবাদীদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই 'অজা' পদে প্রকৃতি বা প্রধানই পরিব্যক্ত।

বৈদান্তিকগণ এতদুত্তরে বলেন যে, একটি মন্ত্র আছে, যথা— "অবাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্দ্ধমুর্দ্ধঃ" অর্থাৎ অধোমুখ ঊর্দ্ধতল একটি চমস (হাতা বা বাটীর ন্যায় যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ) আছে। ইহার অর্থ কি ? বাস্তবিক এতদ্দ্বারা কি বস্তু বুঝাইতেছে, তাহা জানা যায় না। তদ্রূপ আলোচ্য মন্ত্রের কেবল ঐ 'অজা' শব্দের দ্বারা উহাকে "প্রধান" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সমুচিত নহে। "চমস" শব্দে উক্ত মন্ত্রেরই পরবর্ত্তী একটি শ্রুতিতে 'মস্তক' বা 'মুণ্ড'কে বুঝায়। 'চমস' সম্বন্ধে যেমন, 'অজা' সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যদি আর একটি পরবর্ত্তী শ্রৌত-বাক্য পাওয়া যায়, তবে উক্ত 'অজা' পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রতীত হইতে পারে। কঠোপনিষদে একটি শাখায় বলা হইয়াছে যে, জ্বলন্ত স্থূল অগ্নির রক্তবর্ণই মৌলিক তেজের বর্ণ। আর স্থূল অগ্নির শ্বেতবর্ণ মৌলিক রসভূতের বর্ণ, এবং স্থূল অগ্নির কৃষ্ণবর্ণ মৌলিক ক্ষিতির বর্ণ। বেদান্তবাদিগণ বলেন যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত ঐ শ্বেতাশ্ব-তরোপনিষদের শ্রৌত বাক্যটির প্রতিপাদ্য বিষয়, এই ক্ষিত্যপ্‌তেজ-স্তত্ত্ব। উক্ত উপনিষদেই স্থলান্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে,

পরমাত্মা ব্রহ্মের শক্তিরূপিণী মায়া বা প্রকৃতি কর্তৃক এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, মূল মীমাংসিতব্য বিষয় অনুসারে আলোচ্য মন্ত্রটিতে সেই ব্রহ্মশক্তিই সূচিত হইতেছেন, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শ্রৌত বাক্যেও তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। উহাই সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বীজ বা কারণ-তত্ত্ব, এবং ক্ষিত্যপ্-তেজের জনয়িত্রীত্ব-হেতু, উহাকেই ত্রিবর্ণাত্মিকা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে ইহাকে "ছাগী" অর্থে গ্রহণ করিব না কেন? অজা শব্দের দুটি অর্থ; এক 'ছাগী' আর 'যাহা জন্মে না।' "ক্ষিত্যপ্‌তেজ" ভৌতিক পদার্থ। "ভূত" শব্দের অর্থই জাত; অতএব উহা কদাপি অভূত বা অজাত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়, উক্ত "অজা" শব্দটি আলোচ্যস্থলে রূপকভাবেই ব্যবহৃত হইতে পারে। উপনিষদে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্যকে এইরূপ রূপকভাবে "মধু" বলা হইয়াছে, আবার তদ্রূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাণীকে "গাভী" বলা হইয়াছে। অতএব আলোচ্যস্থলেও, যদিও জগতের মূল ভৌতিক-তত্ত্ব ছাগী নহে, তথাপি ঐরূপ রূপকভাবেই "অজা" অর্থাৎ ছাগী বলা হইয়াছে। যাহাহউক, এই সমস্ত বিতর্ক-বিচারের বৈদান্তিক সারনিষ্কর্ষ বা সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও সচরাচর বেদান্ত-শাস্ত্রে সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত "প্রধান"বৎ একটি তত্ত্ববিশেষ সূচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাংখ্যের সেই স্বপ্রধান স্বাধীন প্রধান নহে; তাহা "মায়া" অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি; তাহা ব্রহ্মসাপেক্ষ; সুতরাং স্বপ্রধানা বা

স্বাধীনা নহে। কিন্তু নিরপেক্ষ-বিশ্ব-বিধাতৃত্বহেতু সাংখ্যের "প্রধান" বাস্তবিকই প্রধান; উহা স্বাধীন, স্বসাপেক্ষ ও স্বয়ম্ভুতত্ত্ব। সাংখ্য-শাস্ত্রে কোন ভাবেই উহা ব্রহ্মের অধীন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

११। न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च।

१२। प्राणादयो वाक्यशेषात्।

१३। ज्योतिषैकेषामसत्यन्ने।

১১। বিবিধত্ব ও তত্ত্বাতিরেকত্ব হেতুক সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব-সমূহের সংখ্যা-নির্দ্দেশ দ্বারা প্রধানের শাস্ত্রীয় প্রামাণিকতা সিদ্ধ হয় না।

১২। "পঞ্চজন" পদে প্রাণ ও পরবর্ত্তী শ্রুতির কথিত অপর তত্ত্বচতুষ্টয় বুঝাইতেছে।

১৩। কাণ্বশ্রুতিতে অন্নের উল্লেখ না থাকায়, তৎস্থলে জ্যোতির উল্লেখ করিয়া পঞ্চসংখ্যার পূরণ করা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপর কতিপয় ব্রাহ্মণে, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে পরমাত্মা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা আছে। চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—

"यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः।
तमेवमन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृते मृतमिति॥

অর্থাৎ—

আমি জ্ঞানময় নিত্যামৃতসত্ত্ব।
অনুভবি নিত্য ব্রহ্মামৃততত্ত্ব॥

যিনি পরমাত্মা, যাঁতে স্থিত রয়,
"পঞ্চজন" সহ পরব্যোমাশ্রয় ॥

সাংখ্যবাদীগণ বিচার করেন যে, এই আদিভূত পঞ্চজনই সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব।

১২শ সূত্র এই বলিতেছে যে, "পঞ্চজন" এই বাক্য দ্বারা সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বুঝাইতে পারে না; কেননা, সাংখ্যমতে আত্মা স্বয়ং সেই পঞ্চবিংশতির অন্যতম তত্ত্ব, এবং মহাকাশও একটী তত্ত্ব; কিন্তু এই তত্ত্বদ্বয় প্রমাণসিদ্ধরূপে "পঞ্চজন" বাক্যের অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

অতএব এই "পঞ্চ পঞ্চজন" উক্তির সহিত সাংখ্যতত্ত্ববাদের ঐক্য বা সামঞ্জস্য হয় না। পরমাত্মাই সমগ্র অধ্যায়টীর প্রতিপাদ্য বিষয়; তন্মধ্যে সহসা অপ্রাসঙ্গিক প্রধান বা প্রকৃতিতত্ত্বের আলোচনা অসম্ভব। "পঞ্চজন" পদে সাধারণ ভূততত্ত্ব, এবং "পঞ্চ পঞ্চজন" পদে গন্ধর্ব্ব, পিতৃ, দেব, অসুর, এবং রাক্ষস, এই পঞ্চ; অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং নিষাদ—এই পঞ্চ জাতি বুঝাইতেছে; কিম্বা এতদ্দ্বারা জীবাত্মার দর্শন, শ্রবণ, রসন, শ্বসন এবং মনন—এই পঞ্চ বিষয়তত্ত্বও বুঝাইতে পারে। পরবর্ত্তী শ্রুতিতে—অর্থাৎ উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ।"

অর্থাৎ—

প্রাণের যে প্রাণ, চক্ষু যে চক্ষের ;
শ্রোত্রের শ্রবণ, ভক্ষ্য যে ভক্ষ্যের,
মনের যে মন,
জানে যেই জন।

উপরের ঔপনিষদী উক্তিতে "প্রাণের প্রাণ" প্রভৃতি পদে যে পুরুষের তত্ত্ব প্রতিপাদিত, তাহাতে কোন পদ-গত আপত্তি অসম্ভাবিত। যেহেতু উক্ত তত্ত্বপ্রতিপাদক ঐরূপ শ্রুত্যন্তরও দৃষ্ট হয়। **"তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাः"** (ছা: উ: ২। ১২-২) **"প্রাণোহ পিতা, প্রাণোহ মাতা"** (ছা: উ: ৭। ১৫-১) এতদ্ব্যাখ্যায় এক আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, যেখানে মাধ্যন্দিন শ্রুতি প্রাণ (নিশ্বাস), চক্ষু, কর্ণ, মন এবং অন্ন, এই পঞ্চের উল্লেখ করেন, কিন্তু "কাণ্ব শ্রুতি" ইহার মধ্যে অন্নের উল্লেখ মোটেই করেন না, সেখানে উক্ত পঞ্চপদার্থ স্থলে কেবল চারিটিমাত্র গ্রহণীয় ; কেননা পাঁচটি অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইতেছে না।

৩১শ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যদিও "কাণ্ব শ্রুতি" অন্নের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে জ্যোতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা— **"তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিः"**। সর্ব্বজ্যোতির জ্যোতি জানিয়া তাঁহাকেই দেবগণ উপাসনা করেন। মাধ্যন্দিন শ্রুতিতে পাঁচটি তত্ত্বসত্যই স্বীকৃত হইয়াছে ; সুতরাং "জ্যোতি" তন্মধ্যে বিনিবিষ্ট করিয়া "পঞ্চজন" প্রমাণিত করা নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু 'কাণ্ব'-শ্রুতিতে তদভাবে তাহার প্রয়োজন। অপিচ, "ষোড়শি-ন্যায়ে"ও

এস্থলে তত্তুল্যতাই পরিদৃষ্ট হয়, যেহেতু মীমাংসাদর্শনের ব্যাখ্যানুসারে বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রুতির বশে উহা "অতিরাত্র" যজ্ঞে প্রযুক্ত হইতেও পারে, না হইতেও পারে।

১৪। **কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ।**

১৫। **সমাকর্ষাৎ।**

অনুবাদ।

১৪। আকাশাদি সৃষ্টপদার্থ সম্বন্ধে শ্রুতিতে বিরোধ দৃষ্ট হইলেও, ব্রহ্ম যে জগতের একমাত্র কারণ, তদ্বিষয় কোন বিরোধ নাই।

১৫। অন্যান্য শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিলে, "অগ্রে অসৎ ছিল" এই শ্রুতির মধ্যে, 'অসৎ' অর্থে 'কিছুই ছিল না' এরূপ বুঝায় না।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ঔপনিষদী শ্রুতি-সমূহের সৃষ্টিক্রম একরূপ নহে। কোনও স্থানে দেখা যায়, আকাশ অগ্রে সৃষ্ট হইল, আবার কোনও স্থানে দৃষ্ট হয়—প্রাণ প্রথম সৃষ্ট হইল, কোথাও বা, সর্ব্বপ্রথমে তেজঃসৃষ্টির উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়; সর্ব্বত্র সাম্য দেখা যায় না। যথা, তৈত্তিরীয় উপনিষদে দৃষ্ট হয় "**আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ**" অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভূত হয়। ছান্দোগ্যে দেখা যায় "**তত্তেজোঽসৃজত**" অর্থাৎ তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। এরূপ অন্যান্য শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও দেখা যায়— "**অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত। অসদেবেদমগ্র**

আসীৎ ততোবৈ সদজায়ত" ... সদসদাসীৎ তৎ সত্যমভবৎ" অর্থাৎ প্রথমে 'অসৎ'ই ছিল, তাহা হইতে সতের উৎপত্তি হইয়াছে। এরূপ বিভিন্ন-প্রকার উক্তি হইতে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণ নহেন।

এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এই সমুদয় শ্রুতির বিরোধ বাস্তবিক নহে, কেবল আপাতবিরোধ মাত্র। দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ইহাদের বিরোধ পরিহার করা যাইবে। অপিচ, যদি সৃষ্টিক্রম বিষয়েও কদাপি বিরোধ উপলব্ধ হয়, কিন্তু ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্বন্ধে বিরোধসম্ভাবনা সুসম্ভাবিত নহে। তৈত্তিরীয় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে যে "অগ্রে অসৎ ছিল, তাহা হইতে সতের উদ্ভব হইয়াছে' একথা বলা হইয়াছে,—তাহাতে কখনও এরূপ বলা হয় নাই যে, শূন্য হইতে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন। অসৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের অব্যাকৃতাবস্থাই সূচিত হইতেছে। নামরূপভেদে ঐ 'অসৎ' শব্দের প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাকৃত হইবার পূর্ব্বাবস্থাই। তৈত্তিরীয় এবং ছান্দোগ্যের বর্ত্তমান শ্রুতির সহিত, তাহাদের অন্য-অংশ, এবং অন্যান্য উপনিষৎ মিলাইয়া দেখিলে, উহার ঐরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেমন ছান্দোগ্যে আছে "**অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি**" অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বপদার্থে প্রবেশ করিয়া, নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত হইয়াছিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপবিহীন অব্যাকৃত ব্রহ্মের যে অবস্থা, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, এবং উহা উপলব্ধি করিবার কোনও উপায় নাই, সেই অবস্থাকেই 'অসৎ' বলা হইয়াছে। যখন ব্রহ্মে মায়া শক্তির

বিকাশ হয়, সেই সময়ই সৃষ্টি আরম্ভ হয়, এবং তাহাকেই 'সৎ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ অসৎ অর্থাৎ অনস্তিত্ব হইতে সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না। সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সৎ, তাহা নামরূপবিহীন বলিয়া, অসৎ আখ্যা পাইয়াছে মাত্র।

१६। जगद्वाचित्वात्।

१७। जोबमुख्य-प्राणलिङ्गान्नेतिचेत् तद्व्याख्यातं।

१८। अन्यार्थन्तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके।

অনুবাদ।

১৬। কর্ম্ম জগদ্বাচক বলিয়া ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে।

১৭। যদি বলা হয় যে, জীব এবং মুখ্যপ্রাণ ইহাদের লিঙ্গ বা চিহ্নই সূচিত হইতেছে, তাহা সঙ্গত নহে ; ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৮। জৈমিনি এবং অপর কোনও কোনও আচার্য্য বলেন, প্রশ্ন এবং উত্তর হইতে বুঝা যায় যে, জীবের অন্য অর্থ আছে।

কৌষিতকী ব্রাহ্মণের বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদে নিম্নলিখিত শ্রুতি দৃষ্ট হয়। যথা—'योवै बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्त्ता, यस्य वैतत् कर्म्म, सवै वेदितव्यः।' "হে বালাকি! যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, যাঁহার এই কর্ম্ম, তাঁহাকে জানিতে হইবে।" ষোড়শ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, যাঁহাকে জানিতে হইবে, তিনি ব্রহ্ম, জীবাত্মা কি মুখ্যপ্রাণ। কেহ কেহ বলেন 'यस्य वैतत् कर्म्म' যাঁহার এই কর্ম্ম, ইহাদ্বারা প্রাণ বা মুখ্যপ্রাণ সূচিত

হইতেছে এবং, পরে একটা শ্রুতিতেও 'প্রাণ' কথাটী পাওয়া যায়। প্রাণই পুরুষের এক মাত্র কর্ত্তা, ইহাই দৃষ্ট হয়। যথা "কতম: এক ইবদ্রুতি, প্রাণ্য ইতি স প্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে।" সেই এক দেবতা কে ? না, প্রাণ, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলে। আবার কেহ কেহ বলেন, জীবাত্মাকেই প্রতিপাদন করিতেছে, কারণ পাপপুণ্য জীবাত্মারই। পরের এক শ্রুতিতেও জীবাত্মার উল্লেখ রহিয়াছে। এই সমুদয় তর্ক যুক্তিযুক্ত নহে। বালাকি, অজাতশত্রুকে বলেন যে, তিনি তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিবেন ; এই বলিয়া তিনি সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিতে যে সমস্ত জীবাত্মা বাস করে, তাহাদের উল্লেখ করিলেন। কিন্তু অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ইহারা ব্রহ্ম নহে, ইহারা সকলে জীবাত্মা। বস্তুতঃ সকল স্থানেই ব্রহ্মকে মুখ্যপ্রাণের, ও জীবাত্মারও কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতির "যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" এই অংশের 'এতৎ' শব্দে জগৎ বুঝায়। তাৎপর্য্যতঃ এই জগৎই যাঁহার কর্ম্ম। প্রথমে বালাকি, চন্দ্রমণ্ডলাদিস্থিত পুরুষগণকে ঈশ্বর বলিতেছিলেন। পরে অজাতশত্রু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ সকল পুরুষ স্বষ্ট, উহারা স্রষ্টা হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, ঐ সকল পুরুষের যিনি কর্ত্তা, শুধু পুরুষ কেন, এই সমস্ত জগৎ যাঁহার কর্ম্ম, তিনি বেদিতব্য। প্রথমে আংশিকভাবে "পুরুষগণের কর্ত্তা" বলিয়া, পরে "সমগ্র জগতের কর্ত্তা" বলা হইল। এখানে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-ন্যায়ের অনুসরণ করা হইয়াছে। যেমন ব্রাহ্মণ বলিলে পরিব্রাজক বুঝায় না, কিন্তু পরিব্রাজক বলিলে ব্রাহ্মণ বুঝায়, তদ্রূপ পুরুষগণ বলিলে

সমগ্র বিশ্ব বুঝায় না, কিন্তু জগৎ বলিলে পুরুষগণও তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। **'যস্য বৈতৎ কর্ম্ম'** এই শ্রুতির 'এতৎ' শব্দ জগৎ বুঝায়, সুতরাং শ্রুতির প্রতিপাদ্যার্থ পুরুষকর্ত্তা জগৎকর্ত্তা ব্রহ্ম। 'এতৎ' শব্দ জগদ্বাচী বলিয়া, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বেদিতব্য জগৎকর্ত্তা ব্রহ্ম, জীবাত্মা প্রাণ বা মুখ্য-প্রাণ নহে।

সপ্তদশ সূত্রে বলা হইতেছে, জীব এবং মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ বা চিহ্ন আছে বলিয়া, উহাদের উভয়কে, বা যে কোনওটীকে বেদিতব্য বিষয় বলিয়া বুঝিতে হইবে, কিন্তু পরব্রহ্মকে নয়। এই বিষয়টী প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩১ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যদি জীবাত্মা এবং প্রাণকে বেদিতব্য বিষয় বলা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম, জীবাত্মা এবং প্রাণ, এই তিনটী আমাদের ধ্যানের বিষয় হয়। আর ইহাও দেখান হইয়াছে যে, উপক্রম এবং উপসংহার, এই উভয় স্থানেই ব্রহ্ম বক্তব্য বিষয়, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বিষয়ের অবতারণা অযৌক্তিক। তবে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আবার তাহার অবতারণা কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে **"যস্য বৈতৎ কর্ম্ম"** ইত্যাদি শ্রুতিটির ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রথমে একথাটী উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র।

অষ্টাদশ সূত্রে জৈমিনির মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আচার্য্য জৈমিনি বলেন, জীবাত্মার উল্লেখ থাকাতেই ব্রহ্ম সূচিত হইয়াছেন। অজাতশত্রু বালাকিকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য, একটী সুপ্ত-ব্যক্তিকে যষ্টি-সাহায্যে জাগরিত করেন; এবং তাহাকে বুঝাইয়া দেন

যে, প্রাণ আত্মা হইতে বিভিন্ন। তিনি বালাকিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সুপ্তব্যক্তি কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতে আসিল? বেদান্তমতে সুষুপ্তিসময়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত যখন বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তাহাকে বিজ্ঞানময় আত্মা বলা যায়। এই বিজ্ঞানময় আত্মা পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন। ইনি কোথায় থাকেন? 'থাকেন হৃদয়াকাশে' এইরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। হৃদয়াকাশ বলিতে পরব্রহ্ম বুঝায়। সুতরাং এস্থলে জীবাত্মার লিঙ্গ সূচিত হইলেও, যখন দেখা যাইতেছে, জীবাত্মার পরেও হৃদয়াকাশের উল্লেখ আছে, তখন পরব্রহ্মকেই কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। **"য এষ অন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে"** অর্থাৎ যিনি অন্তর্হৃদয়াকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মে শয়ন করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারাও পরব্রহ্ম সূচিত হন।

১৯। **বাক্যান্বয়াৎ।**

২০। **প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ।**

২১। **উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ।**

২২। **অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ।**

অনুবাদ।

১৯। সমুদয় শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করিলে, পরব্রহ্মই যে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ইত্যাদির বিষয়, তাহা সাব্যস্ত হইবে।

২০। আশ্মরথ্য বলেন, ব্রহ্মকে যে দর্শনের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এতদ্দারা প্রারম্ভে যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ করা হইতেছে।

২১। ঔড়ুলোমি বলেন, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক, যেহেতু মৃত্যুর পরে পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার মিলন হয়।

২২। কাশকৃৎস্ন বলেন যে, পরব্রহ্ম এবং জীবাত্মা অভিন্ন, যেহেতু পরব্রহ্ম জীবাত্মা রূপে অবস্থিতি করেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই শ্রুতি দেখা যায় "**নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' মৈত্রেয়ি, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।**" পতির প্রতি প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন না ইত্যাদি—কোনও বস্তুরই প্রতি প্রীতির জন্য কোনও বস্তুই প্রিয় হয় না। আত্মার প্রতি প্রীতির জন্য সর্ব্ব বস্তুই প্রিয় হইয়া থাকে। আত্মাকেই দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ি! যখন আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত এবং ধ্যাত হয়েন, তখনই সর্ব্ববিষয় বিদিত হওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য যখন বানপ্রস্থাশ্রম-অবলম্বন-মানসে কাত্যায়নী এবং মৈত্রেয়ী নাম্নী পত্নীদ্বয়ের মধ্যে তাবৎ বিষয়বৈভব বিভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন; তখন মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি ধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবেন? যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলেন—"ধনের দ্বারা কেহ কখনও অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। কেবল একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।" জগৎ যে ব্রহ্মময়, তাহাও যাজ্ঞবল্ক্য বুঝাইয়া দেন। বর্ত্তমানসূত্রে প্রশ্ন এই যে, দর্শনাদির বিষয় আত্মা জীবাত্মা,

কি পরমাত্মা ? যাজ্ঞবল্ক্য যে এখানে আত্মা বলিতে পরমাত্মাই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদের অন্যান্য-অংশ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিতেছেন "**যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং**" "যাহাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা আমি কি করিব ?" তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে যাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া, তিনি বলিয়াছেন—"**অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদঃ** ইত্যাদি" এই "মহৎ-ভূত" হইতেই ঋগ্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, আত্মাকে দেখিতে হইবে ইত্যাদি প্রসঙ্গে, তিনি পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, জীবাত্মাকে নহে, কারণ জীবাত্মা হইতে বেদ উদ্ভূত হয় নাই।

২০ সূত্রে আশ্মরথ্যের মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মতকে "ভেদাভেদবাদমত" বলে। ভেদাভেদবাদ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জীব ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। তরঙ্গ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ সমুদ্র এবং অগ্নি হইতে বিভিন্ন, অথচ বিভিন্ন নয়, জীবও তদ্রূপ। যেমন সমুদ্র জানিলে তরঙ্গ অনায়াসে জানা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে জানিলেও ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত তাবৎ বিশ্ব জানা যায়। পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল "**আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বং ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি**" আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সকল বিজ্ঞাত হয়। এখন যদি দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য আত্মা, পরব্রহ্ম না হইয়া জীবাত্মা হন, তাহাহইলে এই প্রতিজ্ঞার হীনতা হয়, কারণ যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদস্থ আত্মাকে জানিলেই সকল জানা

যায়, এরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং এখানে 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মা হইতে পারে না।

২১ সূত্রে ঔড়ুলোমির মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার মত এই যে, দেহমন-ইন্দ্রিয়াদি-উপাধিবিশিষ্ট জীব, শরীর-বিনাশের পর ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে,
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ,
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

নদী-সকল নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেমন সমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি নামরূপমুক্ত হইয়া, পরাৎপর দিব্যপুরুষে লীন হন। ঔড়ুলোমির মতে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন। তিনি বলেন, শ্রুতিতে যে জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ধ্যানধারণা ইত্যাদির দ্বারা যখন জীবাত্মা বিশুদ্ধি লাভ করেন, তখন দেহাবসানে তিনি পরব্রহ্মে লীন হয়েন। জীব যতদিন উপাধিবর্জ্জিত না হন, ততদিন তিনি ব্রহ্ম হইতে যথার্থই পৃথক্। উপাধিবিহীন হইলে জীব—ব্রহ্ম এক। এই মতকে "সত্যভেদাভেদমতবাদ" কহে। অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য, এই মতবাদ কহে।

২২ সূত্রে কাশকৃৎস্নের মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার মতে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ, কারণ, ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

তিনি বলেন, ব্রহ্মই যখন একমাত্র পদার্থ, তখন জীবাত্মা, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। তবে উপাধিহেতু ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্ররূপে দৃষ্ট হয়েন।

২৩। **প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।**

২৪। **অভিধ্যোপদেশাচ্চ।**

২৫। **সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ।**

২৬। **আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।**

২৭। **যোনিশ্চ হি গীয়তে।**

২৮। **এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ।**

৪র্থ পাদঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ।

২৩। ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, কেননা, প্রতিজ্ঞা এবং উদাহরণের সহিত সামঞ্জস্য আছে।

২৪। 'অভিধ্যান' উপদেশ থাকা হেতুও ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ।

২৫। উভয়: অর্থাৎ সৃষ্টি এবং লয়, উভয় কথাই স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ।

২৬। তিনি আপনাকেই আপনি করিয়াছিলেন, এই পরিণাম-হেতু ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ।

২৭। 'যোনি' শব্দ থাকা প্রযুক্তও ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ।

২৮। এতদ্দারা সকলই ব্যাখ্যাত হইল, সকলই ব্যাখ্যাত হইল।

ব্রহ্মই যদি জগতে একমাত্র পদার্থ হন, তবে তাহাদ্বারাই সাধিত হইবে যে, তিনি নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়কারণ। যদি সৃষ্টির উপাদানের জন্য, আর কিছু পদার্থ কল্পনা করা হয় তাহা হইলে ব্রহ্মের সসীমত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারাই তাঁহার অসীমত্ব সাধিত হইয়াছে, যথা **'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম ইতি'** তিনি অসীম এবং তাঁহা হইতে সমস্ত উদ্ভূত হয়। জগতের মূল কারণ যদি দুইটী ধরা যায়, অর্থাৎ একটীকে নিমিত্ত এবং অন্যটীকে উপাদান-কারণ বলা যায়, তাহা হইলে তাহাতে বিবিধ দোষ সংঘটিত হয়। উভয়কেই সসীম এবং পরস্পরাপেক্ষ করিতে হয়, অর্থাৎ একের সহায়তা ব্যতীত অপরের কিছু করিবার সাধ্য থাকে না। এরূপ কল্পনা, যুক্তি এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে পাই, এক ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ। যুক্তিদ্বারা বুঝা যায় যে, জগতের সৃষ্টি যাঁহার আয়ত্তাধীন, তাঁহার পক্ষে স্বসত্তার বহির্ভাগে অন্য কোনও বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাকৃতজনেরা মনে করে, ব্রহ্মকে উপাদান-কারণ বলিলে, তাঁহার অবমাননা করা হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, স্বতন্ত্র উপাদান কল্পনা করিলেই, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব রক্ষিত হয় না। কারণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছু থাকিলে উহা ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। এই সূত্রে বলা হইতেছে, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, যেমন কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে চিন্তা করে, এবং মৃত্তিকাদি উপকরণ লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করে, ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি-বিষয়েও তদ্রূপ **'স ঈক্ষাঞ্চক্রে'** ইত্যাদি

শ্রুতিদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, তিনি কুম্ভকারের ন্যায় চিন্তা করিয়াছিলেন। এই শ্রুতিতে তাঁহাকে কুম্ভকারের ন্যায় নিমিত্তকারণই বলা হইয়াছে; কারণ, কোনও উপাদান-কারণই চিন্তা করিবার উপযুক্ত নয়। উত্তরে বক্তব্য, একথা সত্য, কিন্তু পূর্ব্বপক্ষকারীর এটুকু বুঝা উচিত, যখন ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ অঙ্গীকার করা যুক্তি এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তখন সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্ম, উপাদান-কারণ-সংগ্রহে স্বীয় সত্তার বাহিরে যাইতে পারেন না। তাঁহার স্বীয়সত্তা হইতেই উপাদান-কারণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, **"তত ত্বমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি"** অর্থাৎ তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? যে উপদেশ দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়? এই হইল প্রতিজ্ঞা। অর্থাৎ ইহাদ্বারা এমন কোনও একটী বস্তুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলা হইল, যে একটী জিনিষকে জানিলে সব জানা যায়। উপাদান-কারণ জানিলেই বস্তু জানা যায়। মৃত্তিকা জানিলেই ঘট জানা যায়, কিন্তু কুম্ভকার জানিলে ঘট জানা যায় না। সুতরাং প্রতিজ্ঞা হইতে, ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান কারণ, তাহা অনুমিত হইতেছে। এখন দৃষ্টান্ত দ্বারাও দেখা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। যখন শ্বেতকেতুর পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন যে, ব্রহ্ম জানিলে জগতের তাবৎ বস্তু জানা যায়, তখন উদাহরণ দিতেছেন যে, **"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং**

"**মৃত্তিকেত্যেব সত্যং**" অর্থাৎ যেমন এক মৃত্তিকা জানিলে মৃণ্ময় তাবৎ-পদার্থের জ্ঞান হয়, মৃত্তিকাই একমাত্র সৎ, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পদার্থ কেবল বাক্যের আরম্ভ—মৃত্তিকার বিকার মাত্র। এই উদাহরণ দ্বারাও দেখা যায় যে, ব্রহ্মকে উপাদান-কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত এই উভয়ের দ্বারায় ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ নির্দ্ধারিত হয়। আর এটাও বিচার করা দরকার যে, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনও উপাদান-কারণ জগতে নাই। যেহেতু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত "**একমেবাদ্বিতীয়ম্**।"

২৪ সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অভিধ্যান যথা—"**সোঽকাময়ত, বহুস্যাং প্রজায়েয়**" "**তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়**" তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হই, আমি বর্দ্ধিত হই। এই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। প্রথম কামনা করিলেন, ইহাই নিমিত্ত কারণের পরিচয়। পরে নিজেই বর্দ্ধিত অর্থাৎ স্বসত্তাকে বিস্তৃত করিলেন। ইহা হইতে উপাদান-কারণের পরিচয় পাওয়া যায়।

২৫ সূত্রে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মে সৃষ্টি ও লয় উভয়ের উল্লেখ থাকা নিবন্ধন, ব্রহ্ম উভয়-কারণ। "**যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যস্মিন্ লীয়ন্তে**" অর্থাৎ যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। এরূপ কথা, কেবল উপাদান-কারণের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে। ঘট, মৃত্তিকাতে লীন হয়। 'সাক্ষাৎ' শব্দ থাকাতে সূচিত হইল, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য উপাদান-কারণ নাই।

২৬ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, আত্মা, আত্মাকে সৃষ্টি করেন, এজন্য

আত্মা জগতের উপাদান-কারণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে লিখিত আছে, "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" অর্থাৎ আত্মা নিজেকেই নিজে করিয়াছিলেন। ইঁহাদ্বারায় আত্মার কর্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব উভয়ই সূচিত হইল। অতএব আত্মাই উপাদান-কারণ। যেহেতু, অন্য কোনও উপাদান-কারণের অপেক্ষা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। জগৎ কার্য্যব্রহ্ম, আর ব্রহ্ম কারণব্রহ্ম। কারণব্রহ্ম হইতে এই প্রকৃতি বা কার্য্যব্রহ্মের উৎপত্তি। এটী পরিণাম-হেতু।

২৭ সূত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে, "যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। এই শ্রুতিতে যে 'যোনি' শব্দ আছে, তাহা উপাদান-কারণতাবাচক। যোনি শব্দে উপাদান-কারণ বুঝায়। যথা "পৃথিবী ওষধি-বনস্পতিগণের যোনি" এরূপ বলিলে, তাহাতে উপাদান-কারণত্বই সূচিত হয়।

২৮ সূত্রে কথিত হইতেছে, এতদ্দ্বারা সকলই ব্যাখ্যাত হইল। যদিও এখানে সাংখ্যমতই নিরাস করা হইয়াছে, তথাপি প্রবল-সাংখ্যমত-নিরাশ দ্বারা, অন্যান্য অপ্রবল মতও নিরস্ত হইয়াছে, সুতরাং তত্তন্মতনিরসন পুনর্ব্বার ব্যাখ্যাত হইবার দরকার নাই। "ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ" এই দ্বিরুক্তির দ্বারায় অবগত হওয়া যায়, অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইল।

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।